وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৮ম বর্ষ ● ১০ম সংখ্যা ● আগস্ট ২০২৪

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

আরবরা কেন ফিলিস্তীনিদের সক্রিয় সহযোগিতা করে না?

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٨، محرم و صفر ١٤٤٦هـ / أغسطس ٢٠٢٤م العدد: ١٠، الجزء: ٩٤
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬ || ঈসায়ী ২০২৪ || বঙ্গীয় ১৪৩১

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- আগস্ট	২৫ - মুহাররম	বৃহস্পতিবার	০৪.০৬	০৫.২৮	১২.০৫	০৩.২৯	০৬.৪২	০৮.০৪
০৫- আগস্ট	২৯ - মুহাররম	সোমবার	০৪.০৮	০৫.২৯	১২.০৪	০৩.২৯	০৬.৩৯	০৮.০০
১০- আগস্ট	০৫ - ছফর	শনিবার	০৪.১১	০৫.৩২	১২.০৪	০৩.২৯	০৬.৩৬	০৭.৫৬
১৫- আগস্ট	১০ - ছফর	বৃহস্পতিবার	০৪.১৪	০৫.৩৪	১২.০৩	০৩.২৯	০৬.৩২	০৭.৫১
২০- আগস্ট	১৫ - ছফর	মঙ্গলবার	০৪.১৭	০৫.৩৬	১২.০২	০৩.২৯	০৬.২৮	০৭.৪৬
২৫- আগস্ট	২০ - ছফর	রবিবার	০৪.২০	০৫.৩৭	১২.০০	০৩.২৮	০৬.২৩	০৭.৪১
৩০- আগস্ট	২৫ - ছফর	শুক্রবার	০৪.২২	০৫.৩৯	১১.৫৯	০৩.২৭	০৬.১৮	০৭.৩৫

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-১	-১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	-১
নরসিংদী	-২	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৩	-১
টাঙ্গাইল	০	+১	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	+১
মাদারীপুর	+২	+২	-১
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১
শরিয়তপুর	+১	+১	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+১
শেরপুর	-২	-১	+৩
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৪	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৩	-৪	-৮
খাগড়াছড়ি	-৫	-৬	-৭
রাঙ্গামাটি	-৫	-৬	-৯
বান্দরবান	-৪	-৫	-১০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৪
নোয়াখালী	-১	-২	-৪
লক্ষীপুর	-১	-১	-২
চাঁদপুর	০	০	-২
ফেনী	-২	-৩	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৪	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৮	-৭	-২
মৌলভীবাজার	-৮	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৬	-৬	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৫	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৬	+১০
নাটোর	+৪	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	+১	+৪
বগুড়া	+১	+২	+৬
নওগাঁ	+৩	+৪	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৩	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	০	+৮
দিনাজপুর	-২	+৩	+১০
গাইবান্ধা	-১	০	+৬
কুড়িগ্রাম	-৩	-১	+৭
লালমনিরহাট	-২	-১	+৮
নীলফামারী	০	+২	+১০
পঞ্চগড়	০	+২	+১২
ঠাকুরগাঁও	+২	+৩	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৫	+৫	+১
বাগেরহাট	+৫	+৪	০
সাতক্ষীরা	+৮	+৭	+৩
যশোর	+৬	+৬	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪
কুষ্টিয়া	+৫	+৪	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৪	+৩
নড়াইল	+৫	+৪	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+২	-২
পটুয়াখালী	+৩	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৪	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৩	+৩	-২
ভোলা	+১	+১	-৩
বরগুনা	+৫	+৪	-২

■ সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৮ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

আগস্ট ২০২৪
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১
মুহাররম-ছফর ১৪৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◈ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◈ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◈ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান সম্পাদক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◈ তরিকুল ইসলাম ◈ আল আমিন
◈ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: রাসেল আহমেদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ
» ইসলামে বায়'আত (পর্ব-৩) ০৪
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (পর্ব-৭) ০৬
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» আহলে কুরআনের ফেতনা প্রতিরোধে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেমগণের অবদান ০৮
-মাযহারুল ইসলাম
» বিদআত ও তার কুফল ১০
-মাহবূবুর রহমান মাদানী
» কেন আল্লাহর ইবাদত করব ১৩
-সাঈদুর রহমান
» আল-কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াতের বিশেষ ফযীলত ১৭
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
» কুরআন, হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে মানবজিহ্বার রহস্য ১৯
-মো. হারুনুর রশীদ
» পাশ্চাত্য চশমায় ইসলাম! ২৩
-মুস্তফা মনজুর
» ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায় নয় ২৫
-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার

◈ আরাফার খুৎবা
» আরকানুল ইসলাম ও পাঁচটি জরুরী বিষয় সংরক্ষণের গুরুত্ব ২৭
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ দিশারী
» কনগ্রাচুলেশনস ৩১
-রাকিব আলী

◈ নারীদের পাতা
» মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (পর্ব-৭) ৩৩
-মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

◈ ইতিহাসের পাতা থেকে
» জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা (শেষ পর্ব) ৩৭
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

◈ কবিতা ৩৯
◈ সংবাদ ৪০
◈ জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৪২
◈ প্রধান সম্পাদকের হজ্জ সফর ৪৩
◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

www.al-itisam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

আরবরা কেন ফিলিস্তীনিদের সক্রিয় সহযোগিতা করে না?

চরমপন্থা ও ধর্মান্ধতা ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্যগত আচরণ, কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক হলো তারা মনে করে যে, তাদের চরমপন্থা পবিত্র। তাদের বর্বরতা, হিংস্রতা ও পাশবিকতা সীমালঙ্ঘনের যে-কোনো মাত্রা অতিক্রম করেছে। গাযার সকল স্থাপনা বুলডোজার ও বোমার আঘাতে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে তবুও তাদের নির্বিচার গোলাবর্ষণ থামছে না। তাদের হিংসা ও প্রতিশোধের জ্বালা এত তীব্র যে ফিলিস্তীনি ইয়াতীমদের ক্রন্দন, যুবকদের চিৎকার, আহতদের বিলাপ এবং দুর্গতদের আর্তনাদ তাদের মনে সামান্যতম দয়া সৃষ্টি করে না।

সভ্যতার উত্থান ও পতন হয়, কিন্তু বর্বরতা থেকে যায়। সভ্যতা মানুষের উদারতার প্রতীক না হলেও সভ্য মানুষ চরমপন্থি, ধর্মান্ধ ও নিপীড়ক হয় না; কারণ অশুভ নীতি কেবল অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতার দিকে ধাবিত করে। বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি ন্যায়বিচার ও মানবিকতা শেখানো হয় না? তাহলে সভ্যতার শীর্ষে থাকা মানুষদের এরূপ পশুসুলভ আচরণ কেন! উদার মানুষ মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে আর পদলেহী চাটুকাররা ক্ষমতাবানদের বিশ্বাস করে। তাই পদলেহী বিশ্বাসঘাতকদের অপরাধীদের রক্ষা এবং গাযায় দুর্গতদের মুক্তদের প্রতিরক্ষা দেখে অবাক হবেন না। জন্মগতভাবেই আরব জনগণ ফিলিস্তীন সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে গাযায় হামাস নির্মূল যুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ, গত দুই দশক ধরে আরব রাজনীতিকে প্রভাবিত করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ইরাক যুদ্ধের পর আরব দেশগুলোর শাসন কার্যক্রম পরিচালনায় পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ ভর করে। ফলে ফিলিস্তীনিদের স্বার্থ রক্ষায় তাদের রাজপথে দেখা যায় না।

আরব লীগের ওপর সঊদী আরবের নিয়ন্ত্রণের পর থেকে ফিলিস্তীনিদের পক্ষে প্রতিবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিগত বছরগুলোতে আরব দেশগুলোর রাজপথে ফিলিস্তীনিদের পক্ষে বিক্ষোভ না থাকলেও হাজারো ইয়ামানী রাজপথে তাদের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অধিকার রক্ষায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করা তাদের স্বভাবজাত বিষয়। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল যে অভ্যুত্থান, অস্থিরতা এবং আন্দোলনের মাধ্যমে অন্যায়ের পরিবর্তন সম্ভব।

প্রথমত, আরব নেতারা ইসরাঈলের সামরিক ক্ষমতাকে ভয় পায়। ইসরাঈলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালে তারা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে থাকে। এজন্য দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জনগণের উপর ভয়ভীতি প্রদর্শন বা দমন-পীড়ন চালায়। এমনকি তাদের কিছু প্রজাতন্ত্রী শাসন রাজতন্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের আশা ক্ষীণ হয়েছে। কোনো কোনো আরবদেশে শাসকদের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়লেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি।

দ্বিতীয়ত, আরবদের এমন কোনো রাজনৈতিক নেতা নেই যে ফিলিস্তীনিদের সমস্যা সমাধানে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করবে। একসময় আরব নেতৃত্ব ফিলিস্তীনের পক্ষে জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়। সমস্ত আরব দেশ পশ্চিমের স্বার্থ উপেক্ষা করে ইসরাঈলের পাশাপাশি ফিলিস্তীনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদানের জন্য প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের উক্ত সমাধান ইসরাঈলি নেতারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি।

তৃতীয়ত, সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আমেরিকার তত্ত্বাবধান, গোয়েন্দা সংস্থার নযরদারি এবং দমন-পীড়নের ফলে রাজপথ নিয়ন্ত্রণে শাসকগোষ্ঠীর সক্ষমতা বেড়ে যায়। লেবাননের বিক্ষোভকারী ও ফিলিস্তীনি শরণার্থীরা কঠিন মার্কিন প্রতিরোধের শিকার হয়। আরব সামরিক বাহিনী আমেরিকা এবং তার সহযোগী শাসকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইরাকে আমেরিকার নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনী জনগণের ক্ষোভ থেকে রক্ষায় নিজেদের পাহারা দেয়। আরব সেনাবাহিনীর প্রধান ভূমিকা থাকে আমেরিকার চাহিদা অনুযায়ী বিক্ষোভ দমন ও প্রয়োজনে বিক্ষোভ দমনে প্রয়োজনে জনতাকে হত্যা করা।

চতুর্থত, ফিলিস্তীনিদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো আর ইসরাঈলের উপর শত্রুতা প্রকাশে জনগণকে রাস্তায় নামানো আরব শাসকদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কিন্তু তারা এখন মনে করে ইসরাঈল পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী সহচর। তাদের রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ইসরাঈলি সত্তার অখণ্ডতার উপর নির্ভরশীল। এমনকি তাদের কিছু শাসক ইসরাঈলের সাথে প্রকাশ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে। ফিলিস্তীনের প্রতি সহানুভূতি জানানো এবং জায়নবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শনের অর্থ বিদ্যমান সরকারগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় জড়ানো।

পঞ্চমত, বিনোদন জগতের খবর ও রাজনৈতিক মিথ্যা তথ্য আরব বিশ্বের মানসিকতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির উত্থানে আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রচারমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপক। শাসকদের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং জায়নবাদীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রচারমাধ্যমগুলো কাজ করে। তাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক 'আশ-শারক আল-আওসাত' মিথ্যা সংবাদ

প্রচারে জায়নবাদীদের পৃষ্ঠপোষক 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এবং 'নিউইয়র্ক টাইমস'-কে ছাড়িয়ে গেছে। 'আশ-শারক আল-আওসাত' একটি প্রবন্ধে গাযায় পশ্চিমাদের সাহায্য প্রেরণের খবর প্রচার করে; অথচ রকেট আর যুদ্ধ বিমানের গোলা-বারুদে সেখানকার শিশু ও নারী-পুরুষ ক্ষতবিক্ষত। এই যুদ্ধে আরব মিডিয়া ইসরাঈলের অপরাধের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষোভ ও প্রতিশোধকে প্রশমিত করে। মুহাম্মাদ বিন সালমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর 'সঊদী সরকারও হামাসকে নির্মূল করতে চায়' মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের এমন বক্তব্য সঊদী সরকার অস্বীকার করেনি।

ষষ্ঠত, জায়নিস্ট মিডিয়ার অন্যতম উপাদান হলো বিনোদন সংস্কৃতি। উপসাগরীয় সকল মিডিয়া বিনোদন ও খেলাধুলার প্রচারে ব্যস্ত। এমনকি গল্ফ খেলা যার সাথে আরবদের পরিচয় ছিল না সেটা তাদের শাসকদের বিনোদনের প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে খেলাধুলা ও বিনোদনে আকৃষ্ট করতে ইসরাঈল চেষ্টা চলছে। প্রতিটি আরব দেশের নতুন প্রজন্ম খেলাধুলা ও বিনোদন সংস্কৃতির প্রতি আসক্ত। এখন তাদের স্মৃতিপটে ফিলিস্তীনি শহীদদের পরিবর্তে আরব ক্রীড়াবিদদের নাম বেশি ভাসমান থাকে।

সপ্তমত, ইরাক যুদ্ধ এবং ২০০৬ সালে লেবানন যুদ্ধের পর উপসাগরীয় শাসকরা সাম্প্রদায়িক মতভেদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে এবং অভ্যন্তরীণ বিপদের প্রতি তাদেরকে মনোযোগী করতে চেষ্টা চালায়। আরবদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করার সংস্কৃতি একটি সুচিন্তিত নীতি। প্রাচ্যনীতির সংস্কৃতি প্রমাণ করে আরবরাই তাদের সমস্যা এবং দুর্ভোগের জন্য দায়ী। উপসাগরীয় সরকারগুলো এই মতবাদকে গ্রহণ করে এটিকে জনপ্রিয় করেছে। প্রতিটি আরব দেশের সেনাবাহিনী সামাজিক মিডিয়ায় একথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, জায়নবাদী এজেন্ডা আরবদের জন্য হুমকির কারণ নয়।
অষ্টমত, অনেক আরব দেশে সক্রিয় রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়েছে কিংবা নিষেধাজ্ঞার কবলে বন্দি আছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সব আরব দেশের প্রধান দলগুলো ফিলিস্তীনের পক্ষে সক্রিয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ক্ষমতায় আসার আগে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার আহ্বানে সর্বাগ্রে ছিল বাথ পার্টি। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর মুক্তি ও ঐক্যের সংগ্রামের পরিবর্তে নিজেদের শক্তি টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে মনোনিবেশ করে। অনেক আরব দেশ বিরোধী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে নিজস্ব দল গঠন করে যারা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। প্যালেস্টাইনপন্থি সক্রিয়তায় মত প্রকাশের কাজে জনগণকে তারা গাইড করেন না। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তীনপন্থি আন্দোলনগুলো পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, কারণ সেখানে আরব শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দেয়নি; বরাং সেখানে ছাত্র ও প্রগতিশীল সংগঠন নেতৃত্ব দিয়েছিল।

নবমত, আরব দেশগুলোতে ফিলিস্তীনি শিবিরগুলোর ভূমিকা বদলে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, লেবাননে ফিলিস্তীনি শিবিরগুলো ফিলিস্তীনপন্থি সক্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। শিবিরগুলো থেকে বিক্ষোভের প্রস্তুতি এমনকি শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র বিপ্লবী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হতো। লেবাননে আজকের ফিলিস্তীনি শিবিরগুলো ফাতাহ এবং হামাস দলে বিভক্ত। তারা সঊদী আরব কিংবা আরব আমিরাতের প্রতি অনুগত থাকে।

দশমত, আক্বীদাগত পার্থক্য তাদের বিভাজনের অন্যতম কারণ। একজন মুসলিমের ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকা বা না থাকার চূড়ান্ত মাপকাঠি তার আক্বীদা। বর্তমানে আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো ইরানের সাথে ফিলিস্তীন বিশেষ করে হামাসের সম্পর্ক গভীর। ইরান হামাসকে ইসরাঈলের মোকাবিলা করতে সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইরানের মদদপুষ্ট সশস্ত্রগ্রুপ হিযবুল্লাহ এর সাথেও তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আক্বীদাগত পার্থক্যের কারণে সালাফরা মনে করে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা জরুরী। কারণ, যখন কোনো জাতির আক্বীদা ভ্রান্ত হয়, তখন তাদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া স্বাভাবিক।

আরব বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ অকুণ্ঠভাবে ফিলিস্তীনিদের সমর্থন করে। তারা ফিলিস্তীনিদের সংগ্রামকে নিজেদের মর্যাদা ও মুক্তির আন্দোলনের প্রতিফলন হিসেবে দেখে। কাজেই আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের উচিত হবে পশ্চিমা কিংবা ইউরোপের কোনো শক্তির কাছে মাথা নত না করা; বরং জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশ পরিচালনা করা। সততার সাথে দেশ পরিচালনা করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় অতি সন্নিকটে' *(আছ-ছফ, ৬১/১৩)*।

আরব জনগণ কি মনে করে যে ওয়েবসাইটে একটি টুইট বা মন্তব্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট? অন্দলোন সংগ্রাম সরকার পরিবর্তন করে, যখন তারা মনে করে উক্ত কারণের জন্য সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছে। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের শাসককে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলিমদের সহযোগিতা করার কিংবা তাদের জনগণকে অত্যাচারী শাসককে পরিবর্তন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! *(স.)*

ইসলামে বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৩)

বায়‘আতের শর্ত: বায়‘আত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য—

(১) গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় (أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ) ব্যক্তিবর্গের একটি দল বায়‘আত সম্পাদনে সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন।

(২) যার বায়‘আত গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে রাষ্ট্রনেতা হওয়ার শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

(৩) যার বায়‘আত গ্রহণ করা হবে, তাকে বায়‘আত গ্রহণে রাজি হতে হবে। তিনি যদি বায়‘আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, তাহলে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

(৪) বায়‘আত নির্দিষ্টভাবে একজনের জন্যই হতে হবে। একাধিক ব্যক্তির বায়‘আত সংঘটিত হবে না।

(৫) বায়‘আত কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে হতে হবে। এ দু’টির উপর আমল করতে হবে এবং জনগণকে এ দু’টির উপর আমলের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) বায়‘আতের ব্যাপারে জনগণকে স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় বায়‘আত গ্রহণ করবেন; কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

এগুলো বায়‘আতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত, যেগুলো পূর্ণ হলে বায়‘আত শুদ্ধ হবে। আর এগুলোর কোনো একটি না থাকলে বায়‘আত সংঘটিত হবে না।[১]

বায়‘আতের পদ্ধতি: রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যার মধ্যে যথোপযুক্ত শর্ত পাওয়া যাবে, তাকে নির্বাচন করতে ও ক্ষমতায় বসাতে দেশের সজাগ, বিবেকবান, গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামা ও ব্যক্তিবর্গ প্রথমে তার হাতে হাত রেখে বায়‘আত করবেন। তবে তাদের সবাইকে সরাসরি বায়‘আত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে, সেটাও ঠিক নয়। যাহোক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরে সাধারণ জনগণের সবাই মৌখিক বায়‘আত করবেন বা মেনে নিবেন।[২] সাধারণ জনগণ কর্তৃক মেনে নেওয়াই যথেষ্ট হবে; তাদেরকে হাতে হাত রেখে বায়‘আত করতে হবে না।

মাযেরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ وَلَا يَلْزَمُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ بَلْ يَكْفِي الْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لَا يُخَالِفَهُ وَلَا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ তথা গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রনেতার বায়‘আত গ্রহণই যথেষ্ট হবে। তবে তাদের সবার অংশগ্রহণ যেমন ওয়াজিব নয়, তেমনি তাদের সবার সেখানে উপস্থিত হওয়া ও রাষ্ট্রনেতার হাতে হাত রেখে বায়‘আত করাও জরুরী নয়। বরং এমনভাবে রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য করা ও তাকে মেনে নেওয়া যথেষ্ট হবে যে, তারা তার বিরোধিতা করবেন না এবং তার শক্তি খর্ব করবেন না’।[৩]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَمَّا الْبَيْعَةُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ وَلَا كُلِّ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ ... لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ وَيُبَايِعَهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِذَا عَقَدَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِلْإِمَامِ الِانْقِيَادُ لَهُ وأن لا يظهر خلافا ولا يشق لعصا ‘বায়‘আতের ব্যাপারে আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, বায়‘আত শুদ্ধ হওয়ার জন্য না সকল মানুষের তাতে অংশগ্রহণ শর্ত, না গণ্যমান্য সকল ব্যক্তির অংশগ্রহণ শর্ত। বরং আলেম, নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের একত্রিত করা সম্ভব, তাদের বায়‘আতে অংশগ্রহণ শর্ত। প্রত্যেকের হবু রাষ্ট্রনেতার নিকট উপস্থিত হয়ে তার হাতে হাত রেখে বায়‘আত করা আবশ্যক নয়। বরং নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বায়‘আত সংঘটিত হলে সেই রাষ্ট্রনেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, তার বিরোধিতা না করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা জরুরী’।[৪]

উল্লেখ্য, কেবল পুরুষরা মনোনীত ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বায়‘আত করবেন। আর নারীরা শুধু মৌখিক বায়‘আত করবেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ তাদেরকে (নারীদেরকে) বলতেন, «انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ ‘যাও, আমি তোমাদের বায়‘আর গ্রহণ করেছি’। আল্লাহর কসম! কথার মাধ্যমে বায়‘আত গ্রহণ ছাড়া রাসূল ﷺ-এর

বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. মাউসূ‘আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ৫/৩০৭-৩০৮।

২. আল-মাউসূ‘আতুল ফিক্বহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, ৯/২৭৪-২৭৫ ও ২৮০।

৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৭/৪৯৪।

৪. নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, ১২/৭৭।

হাত কখনো কোনো নারীর হাত স্পর্শ করেনি।[৫] ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, فِيهِ أَنَّ بَيْعَةَ النِّسَاءِ بِالْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ كَفٍّ ‘হাদীছটিতে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের বায়‘আত হবে কথার মাধ্যমে, এখানে হাত ধরার কোনো নিয়ম নেই’।[৬]

বায়‘আত গ্রহণের অধিকার কার? এ বিষয়টা নিয়ে আমাদের দেশে যথেষ্ট ধুম্রজাল আছে। সেকারণে অনেককে বায়‘আত নিয়ে টানাটানি করতে দেখা যায়।

বায়‘আত কেবলমাত্র মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা এবং কোনো দেশ বা অঞ্চলের মুসলিম সরকারের অধিকার। মুসলিম জাহানের একক খলীফা ছাড়া অন্য কারো জন্য বায়‘আত নেই মর্মে কেউ কেউ মত দিলেও তা আসলে সঠিক নয়। আমীর ছান‘আনী রহিমাহুল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী مَنْ خَرَجَ عَنْ الطَّاعَةِ ‘যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল’-এর ব্যাখ্যায় বলেন, أَيْ طَاعَةِ الْخَلِيفَةِ الَّذِي وَقَعَ الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ خَلِيفَةُ أَيِّ قُطْرٍ مِنْ الْأَقْطَارِ إِذْ لَمْ يُجْمِعْ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ أَثْنَاءِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ بَلْ اسْتَقَلَّ أَهْلُ كُلِّ إِقْلِيمٍ بِقَائِمٍ بِأُمُورِهِمْ إِذْ لَوْ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى خَلِيفَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَقَلَّتْ فَائِدَتُهُ. ‘আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল মানে এমন খলীফার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল, যার আনুগত্য করার ব্যাপারে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। এখানে যে কোনো অঞ্চলের খলীফাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আব্বাসীয় শাসনামলের মাঝামাঝি সময় থেকে (আজ অবধি) সমগ্র মুসলিম জাহানে একক খলীফার ব্যাপারে মানুষ একমত হয়নি; বরং প্রত্যেকটা অঞ্চলের মানুষ নিজেদের শাসক নিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। তাছাড়া হাদীছটিকে যদি মুসলিমদের একক খলীফার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এর ফায়দা কমে যাবে’।[৭]

আল্লামা শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আর ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও এর সীমানা প্রশস্ত হওয়ার পর একথা সুবিদিত যে, এখন প্রত্যেকটা অঞ্চলের শাসনভার একেকজন শাসকের উপর পড়েছে। অন্যান্য অঞ্চলেও একই অবস্থা। তাদের কারো আদেশ-নিষেধ অন্যের অঞ্চলে বাস্তবায়িত হয় না। এমন অনেক শাসক হওয়াতে কোনো দোষ নেই। এসব শাসকের প্রত্যেকের বায়‘আত সংঘটিত হওয়ার পর তার আনুগত্য করা ঐ অঞ্চলের লোকদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে, যেখানে তার আদেশ-নিষেধ কার্যকর হয়। যে অঞ্চলে কারো শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানকার লোকজন তার বায়‘আত নিয়েছে, সে অঞ্চলে যদি কেউ তার বিরোধিতা করতে আসে, তাহলে তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে। ...(পাঠক!) এই বিষয়টি উপলব্ধি করুন। কারণ তা শরী‘আতের সাধারণ নিয়ম এবং দলীল-প্রমাণের সাথে মিলে যায়। আর আপনি এর বিপরীত বক্তব্যকে পরিহার করুন। কেননা ইসলামের শুরুতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান সময়ের শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সূর্যালোকের চেয়েও স্পষ্ট। যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করবে, সে মিথ্যুক; তার কাছে দলীল পেশ করার উপযুক্ত সে নয়; কারণ সে তা উপলব্ধি করতে পারে না’।[৮]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সকল মাযহাবের ইমামগণ ইজমা পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো দেশ বা অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করে, সকল ক্ষেত্রে তার বিধান গোটা মুসলিম জাহানের একক খলীফার মতোই। এটা যদি না হতো, তাহলে দুনিয়া ঠিক থাকত না। কেননা ইমাম আহমাদের আগে থেকে আজ পর্যন্ত এই লম্বা সময় ধরে মানুষ শুধু একজন শাসকের অনুসরণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেনি; অথচ তারা এমন একজন আলেমের কথাও জানেন না, যিনি বলেছেন যে, সারা জাহানের একক খলীফা ছাড়া কোনো হুকুম ও বিচার বিশুদ্ধ হবে না’।[৯]

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ একসময় সমগ্র মুসলিম জাহানের একক খলীফা ছাড়া বায়‘আত সম্পন্ন হবে না বলে মন্তব্য করলেও পরবর্তীতে তিনি এই মত থেকে ফিরে আসেন। শায়খ আলবানীর বিখ্যাত ছাত্র শায়খ আলী হাসান হালাবী প্রণীত ‘মাসায়েল ইলমিইয়্যাহ ফিস সিয়াসাতি ওয়াদ দা‘ওয়াতিশ শার‘ইয়্যাহ’ গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন এবং জরুরী অবস্থায় একাধিক শাসক থাকতে পারেন বলে এই বইয়ের তথ্যকে তিনি গ্রহণ করেন। শায়খ হালাবী বলেন, وَلَمَّا (رَاجَعَ) نَفَعَ اللهُ بِعُلُوْمِهِ- كِتَابَنَا هَذَا-، (وَصَحَّحَهُ)، وَوَقَفَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَالِيَةِ الَّتِي تُجِيْزُ مِثْلَ هَذَا (التَّعَدُّدِ) لِلضَّرُوْرَةِ-: تَبَنَّاهُ، وَانْشَرَحَ لَهُ صَدْرُهُ، وَاطْمَأَنَّ بِهِ (শায়খ আলবানী) যখন আমার প্রণীত এই বইটি সম্পাদনা ও সংশোধন করেছিলেন এবং উচ্চ গবেষণালব্ধ বক্তব্যগুলো অবগত হয়েছিলেন, যেগুলো জরুরী কারণে একাধিক শাসকের বৈধতা দেয়, তখন এটাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এর জন্য তার বক্ষ প্রসারিত হয়েছিল এবং এতেই প্রশান্তি লাভ করেছিলেন -আল্লাহ তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করুন-’।[১০]

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৬৬।
৬. নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, ১৩/১০।
৭. সুবুলুস সালাম, (দারুল হাদীছ, তা. বি.), ২/৩৭৪।
৮. আস-সায়লুল জাররার, (দারু ইবনি হাযম, প্রথম প্রকাশ, তা. বি.), পৃ. ৯৪১।
৯. আদ-দুরার আস-সানিইয়্যাহ ফিল আজবিবাতিন নাজদিইয়্যাহ, (তাহক্বীক: আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ক্বাসেম, ৬ষ্ঠ প্রকাশ: ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ৫/৯।
১০. আলী আল-হালাবী, মাসায়েল ইলমিইয়্যাহ ফিস সিয়াসাতি ওয়াদ দা‘ওয়াতিশ শার‘ইয়্যাহ, (মাকতাবাতু ইবনিল ক্বাইয়িম, কুয়েত, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭৪, টীকা নং- ২।

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(জানুয়ারি’২৪ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৭)

(৬) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে আর তোমাদের হাতকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করে নাও। আর তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং তোমাদের পা ধৌত করো টাখনু পর্যন্ত’ *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*।

উপরিউক্ত আয়াতে ব্যবহৃত ‘ইলা’ (إِلَى) অব্যয়টি আরবীতে ‘পর্যন্ত’ অর্থ প্রদান করে থাকে এবং ‘সহ’ অর্থও প্রদান করে থাকে। অতএব, দুই ধরনের অর্থ করা সম্ভব তথা কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হবে অথবা কনুইসহ ধৌত করতে হবে। কনুই পর্যন্ত হলে হাত ধৌত করার সময় কনুই অন্তর্ভুক্ত হবে না। কনুই স্পর্শ করার আগেই হাত ধোয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর কনুইসহ অর্থ করলে হাত ধোয়ার সময় কনুই পার হয়ে পুরো কনুইসহ হাত ধৌত করতে হবে। উভয় অর্থই আরবী ভাষা অনুযায়ী বিশুদ্ধ।

উপরিউক্ত আয়াতে আরবী ভাষার সাথে সম্পৃক্ত আরো একটি মাসআলা রয়েছে। আয়াতে মহান আল্লাহ ছালাতে দাঁড়ানোর জন্য ওযূ করার আদেশ প্রদানের বাক্য শুরু করেছেন মুখমণ্ডল ধৌত করার মাধ্যমে। সেখানে আরবী বর্ণ ‘ফা’ ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত ‘ফা’ বর্ণটি যদি ‘তা‘ক্বীব’ বা ‘তারতীব’ তথা ধারাবাহিকতা বর্ণনার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আয়াতে বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী হয়ে যাবে। তথা সেক্ষেত্রে ওযূ শুরু করতে হবে মুখমণ্ডল ধৌত করার মাধ্যমে এবং পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে যে ধারাবাহিকতা বলা হয়েছে, সেভাবেই ওযূ করতে হবে। অন্যদিকে একদল মন্তব্য করেছেন, এই আয়াতটি ‘ফা তা‘ক্বীব’ দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে সবগুলোর ক্ষেত্রে ‘ওয়াও আতফ’ তথা সংযোজনজ্ঞাপক ওয়াও ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ওয়াও আতফ’ ধারাবাহিকতা বুঝায় না; বরং শুধু সংযোজন বুঝায়। সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী নয়। তথা কেউ চাইলে পা ধৌত করার মাধ্যমেও ওযূ শুরু করতে পারে।

উক্ত আয়াতে আরবী ভাষা সংক্রান্ত আরো একটি মাসআলা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ‘তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং পা টাখনু পর্যন্ত’ *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*। এই অংশে মাথা মাসাহ করার উপর আতফ তথা সংযুক্ত করা হয়েছে পা-কে। ফলত, পা মাসাহ করতে হবে নাকি ধৌত করতে হবে তা নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে আরজুল বা পা শব্দের ইবারত নির্ধারণ করবে যে, আয়াতটির অর্থ কী দাঁড়াবে? যদি আরজুলা পড়া হয় তথা লামে যবর দিয়ে পড়া হয়, তাহলে পা আতফ হবে মুখমণ্ডলের উপর। আর মুখমণ্ডল ধৌত করার কথা বলা হয়েছে, তাই সেক্ষেত্রে পাও ধৌত করতে হবে। আর যদি পড়া হয় আরজুলি তথা লামে যের দেওয়া হয়, তাহলে বাক্যাংশটি আতফ হবে রুঊস বা মাথার উপর। আর মাথা মাসাহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, পা-ও মাসাহ করতে হবে। আরবী ব্যকরণগত এই মতভেদের সমাধান রয়েছে।

অতএব, উল্লিখিত আয়াত থেকে একটি বিষয় দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে, আরবী ভাষাগত বিভিন্ন মতভেদের কারণে শারঈ আহকামে ব্যাপক মতভেদ তৈরি হতে পারে। সুতরাং হাদীছ ব্যতীত শুধু নিজের বিবেক বা ভাষাকে কাজে লাগিয়ে কুরআনের সঠিক অনুবাদ দাঁড় করানো কখনোই সম্ভব নয়। কুরআন পরিপূর্ণ বুঝা কখনোই সম্ভব নয়। বরং যার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর ব্যাখ্যা ও বুঝই কুরআন বুঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। আর সেই ব্যাখ্যা বা বুঝ জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর হাদীছ। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ‘যারা পায়ের কিছু অংশ ধৌত করতে অবশিষ্ট রাখবে, তাদের সেই অবশিষ্ট অংশ জাহান্নামে’।[১] এই হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পা ধৌত না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। বরং পা ধৌত করার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অনুরূপ বহু হাদীছে রাসূল ﷺ স্বয়ং ছাহাবীদেরকে ওযূ করে দেখিয়েছেন এবং সেখানে তিনি কনুইসহ ধৌত করেছেন, যা উক্ত আয়াতের অর্থকে পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট করে।

(৭) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ‘আর তোমরা ছিয়াম পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*।

উপরিউক্ত আয়াতে ‘ইলা’ (إِلَى) দ্বারা যদি অর্থ করা হয় রাতসহ, তাহলে সূর্যাস্তের পরেও ছিয়াম থাকা যাবে। আর যদি ইলা দ্বারা পর্যন্ত অর্থ করা হয়, তাহলে রাত শুরু হতেই ছিয়াম শেষ করতে হবে। আরবী ভাষা অনুযায়ী দুই ধরনের অর্থ করারই সুযোগ রয়েছে। কিন্তু রাসূল ﷺ নিজে হাদীছের মাধ্যমে এই আয়াতের অর্থ করে দিয়েছেন যে, রাত পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে হবে তথা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, لا يزالُ النَّاسُ بِخَيرٍ ما عَجَّلوا الفِطْرَ ‘মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন মানুষ দ্রুত ইফতার করবে’।[২]

ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭৫।

(৮) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ‘আর তোমরা পবিত্র ‘ছাঈদ’ দিয়ে তায়াম্মুম করো’ *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*।

আরবী ভাষায় ‘ছাঈদ’ শব্দটি শুধু মাটির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং মাটির উপর যা কিছু আছে, তার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কারো মতে শুধু মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে, অন্য কিছু দিয়ে নয়। আর কারো মতে ইট-পাথর ও বালু দিয়েও তায়াম্মুম করা যাবে।

(৯) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ‘আর পবিত্র ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না’ *(আল-ওয়াক্বি‘আহ, ৫৬/৭৯)*।

উক্ত আয়াতে মুতাহহারূন দ্বারা ফেরেশতা অথবা মানুষ উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারে। মানুষ উদ্দেশ্য হলে মানুষের জন্য পবিত্র হয়ে কুরআন স্পর্শ করতে হবে। তখন জুমলা খাবারিয়্যা হলেও উদ্দেশ্য হবে ইনশা। তথা সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে আদেশ প্রদান উদ্দেশ্য। তখন আয়াতটির অনুবাদ দাঁড়াবে মানুষ যেন পবিত্র হয়েই কুরআন স্পর্শ করে। আর ফেরেশতা উদ্দেশ্য হলে ফেরেশতারা কখনোই অপবিত্র হয় না। সে অবস্থায় মানুষের জন্য পবিত্র হয়ে কুরআন স্পর্শ করার আদেশ প্রমাণিত হবে না।

(১০) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ ‘আর তার স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সে হেসে উঠল’ *(হূদ, ১১/৭১)*।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীর বর্ণনা দিয়েছেন। যখন মহান আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে জানালেন যে, তারা মূলত লূত আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছে, তখন সারা (আলাইহাস সালাম) এই কথাগুলো পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে শুনছিলেন আর ফেরেশতাগণ তাকে তার সন্তান ইসহাক্ব এবং পৌত্র ইয়াকূবের বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করেন। এই বর্ণনা দিতে গিয়ে এখানে আরবী ‘যহিকাত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবীতে হেসে উঠার জন্য এবং হায়েয হওয়ার জন্য উভয় অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী সুসংবাদ শুনে হেসে উঠলেন অথবা সন্তান সম্ভবা হবেন এই জন্য হায়েযা হলেন।

(১১) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ‘আর তালাকপ্রাপ্তারা স্বেচ্ছায় তিন কুরূ ইদ্দত পালন করবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/২২৮)*।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতের বর্ণনা দিয়েছেন। একজন তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ইদ্দত পূর্ণ করার জন্য তিন কুরূ অপেক্ষা করবেন। অতঃপর সে চাইলে অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত কুরূ শব্দটি আরবী ভাষায় হায়েয তথা ঋতুস্রাব এবং তুহূর তথা পবিত্র অবস্থা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাষাগত এই মতভেদের কারণে ফক্বীহদের মধ্যেও মতভেদ তৈরি হয়েছে। তাদের কারো মতে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হচ্ছে তিন ঋতুস্রাব আর কারো মতে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হচ্ছে তিন পবিত্র অবস্থা। এই ধরনের মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে হাদীছই একমাত্র সমাধান দিতে পারে।

(১২) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ ‘সেদিন প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামের নামে ডাকা হবে। *(আল-ইসরা, ১৭/৭১)*।

কিয়ামতের মাঠে মানুষকে কীভাবে ডাকা হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই আয়াতে। এই আয়াতে ইমাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় উম্মুন অর্থ হচ্ছে মা। আর এই উম্মুন শব্দটির বহুবচন হচ্ছে ইমাম।[৩] সেক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ দাঁড়াবে প্রত্যেক মানুষকে তাদের মায়ের নামে ডাকা হবে। আর ইমাম শব্দটি দ্বারা যদি নেতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে প্রত্যেক মানুষ যে মতাদর্শ অনুসরণ করত বা যে দল-মত পোষণ করত তার নেতার নাম ধরে তাকে ডাকা হবে। এই ধরনের বিতর্কিত বিষয়গুলোতে হাদীছই একমাত্র সমাধান দিতে পারে।

(১৩) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ‘আর মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বললেন’ *(আন-নিসা, ৪/১৬৪)*।

আরবী ভাষায় কাল্লামা শব্দটি কথা বলা ও আঘাত করা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকেই মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে মহান আল্লাহর কথোপকথনকে অস্বীকার করেছেন। তারা উক্ত আয়াতে কাল্লামা শব্দটি দ্বারা আঘাত করা অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(১৪) মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ‘তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর’ *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*।

উপরিউক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কখন কখন তায়াম্মুম করা সম্ভব তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কী কারণে ওযূ ভেঙ্গে যেতে পারে তার একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। আর তা হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ ‘লামাসা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর আরবী ভাষায় ‘লামাসা’ শব্দটি স্পর্শ করা এবং সহবাস করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি আমরা স্পর্শ করা অর্থ গ্রহণ করি, তাহলে স্ত্রীকে স্পর্শ করলেই ওযূ ভেঙ্গে যাবে। অনেক ফক্বীহ এই মর্মে ফতওয়াও প্রদান করেছেন। তাদের দলীল এই আয়াত। অন্যদিকে আমরা যদি সহবাস করা অর্থ গ্রহণ করি, তাহলে সহবাস করলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। অধিকাংশ ফক্বীহ এই বিষয়ে মত প্রদান করেছেন। এই ধরনের বিতর্কিত বিষয়গুলোতে হাদীছই একমাত্র সমাধান দিতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু ভাষার মাধ্যমে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ কখনোই আমাদেরকে সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে সহযোগিতা করতে পারবে না। কেননা একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাশাপাশি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন ক্বিরাআত রয়েছে। ক্বিরাআতে ইবারত পরিবর্তন হয়, অর্থও পরিবর্তন হয়। অতএব, কুরআন সঠিকভাবে বুঝার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ছাহাবীগণ কীভাবে কুরআনকে বুঝেছেন তা জানা ও বুঝার বিকল্প নেই।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৩. ফাতহুল ক্বাদীর, ৩/২৯২।

www.al-itisam.com

আহলে কুরআনের ফেতনা প্রতিরোধে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেমগণের অবদান

-মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা: ইসলামের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যে যুগে যুগে ইসলামবিদ্বেষী মহল মুসলিম জাতিকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ করার হীন অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে, যেটা আমাদের প্রায় সকল মুসলিম অবগত। অমুসলিম গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আমরা সকলেই উপলব্ধি করি, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চেষ্টা করি। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রায় সকলেই ঐকমত্য পোষণ করি। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি আমাদের মুসলিম নামধারী, লেবাসধারী, নেক ছুরতে আগমনকারী এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা মুসলিমদের ঈমান হরণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কুফরী আক্বীদা ও মতবাদের সবক দিয়ে দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বেদ্বীন, সংশয়বাদী মুসলিম এমনকি নাস্তিক পর্যন্ত বানাচ্ছে। যদিও তারা আদৌ কোনো ইসলামী দল কিংবা মুসলিম নয় তথাপিও তারা ইসলামী দল দাবি করে এমন হীন অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত কুফরী মতবাদ লালনকারী দলের মধ্যে অন্যতম একটি দল হলো 'আহলে কুরআন' (তাদের দাবি হলো কুরআন মানি; কিন্তু হাদীছ মানি না)। এরা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' দাবী করলেও এরা মূলত: কুরআন ও হাদীছ বিদ্বেষী, এতদুভয়ের অপব্যাখ্যাকারী। এই হাদীছ অস্বীকারকারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের এই ভুল বুঝ এবং অপব্যাখ্যা এমনকি কুফরী মতবাদকে প্রচার-প্রসার ছাড়াও তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নানামুখী অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই ইসলাম বিধ্বংসী মতবাদের দৌড় কতদূর এবং তা প্রতিরোধে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেমদের অবদান কেমন ছিল, তা জানা সময়ের দাবি বলেই আজকের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে কুরআন (তথা সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের) অপতৎপরতার উৎপত্তি:

ভারতীয় উপমহাদেশে 'আহলে কুরআন' ফেতনার ধাবমান লাগামহীন অপচেষ্টার গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় বিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এদের গোড়াপত্তন হয়। আহলে কুরআনের এই ফেতনার আন্দোলনে যে কয়েকজন নেতৃত্ব দেয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও আব্দুল্লাহ আল-যাকরালভী। আব্দুল্লাহ আল-যাকরালভী, যিনি অস্বীকার বলেন, সুন্নাহ শরীআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুন্নাহ তথা হাদীছ শরীআতের হুজ্জাত (দলীল) নয় বলে চরমভাবে তারা অস্বীকার করেন এবং সে এই সুন্নাহ অস্বীকার মিশনে বিভিন্নভাবে খোঁড়া যুক্তি, বক্তব্য, লেখনীর মাধ্যমে সব ধরনের মুসলিমদের মধ্যে মারাত্মক সংশয়, সন্দেহের বীজ বপন করার পাঁয়তারা চালায়। মূলত হাদীছ অস্বীকার করার এই নিকৃষ্ট আন্দোলনের মূল নেতৃত্বদানকারী হলো প্রাচ্যবিদগণ (Orientalist)। তাদের মদদ পেয়ে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে এই ফেতনার সূত্রপাত ঘটে। এই প্রাচ্যবিদগণ মানবতার ফেরিওয়ালা হয়ে মুসলিম সমাজকে মারাত্মক সংশয়বাদী ও নাস্তিকতার বিষবাষ্পে আবৃত করার লক্ষ্যে নিজেদের বিসর্জন করে। ফলে তারা মুসলিম জাতিসত্তা, আক্বীদা, তাহযীব, তামাদ্দুনের উপর সন্দেহের বিষাক্ত তির ছুড়ে। যার ফলে সময়ের স্রোতে অধিকহারে মুসলিম পরিবার, তরুণ প্রজন্ম সংশয়বাদী হিসেবে গড়ে উঠে। মূলত সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই তাদের মিশন সফল করার লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বিশেষ করে প্রাচ্যবিদগণ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। কারণ যখন কোনো মুসলিমের অন্তরে তার শরীআত তথা হাদীছের উপর সন্দেহ, ধারণা, মিথ্যাচার ঢোকানো সম্ভব হবে ঠিক তখনই তাকে সহজেই করায়ত্ত করা সহজ হবে। নচেৎ তাকে বশ করা সম্ভব নয়। তাই তারা বড় বড় নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং এই উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে মুক্তবুদ্ধির চিন্তার পরিশীলিত রূপায়নের মতবাদকে তরুণদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে। সেইসাথে তারা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম সন্তানদের পড়ালেখা করার সুযোগ তথা স্কলারশিপ এর ব্যবস্থা করে। তাদের এই দীর্ঘমেয়াদি নগ্ন ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য 'হাদীছ অস্বীকার' করার আন্দোলনকে জোরদার করতে নেতৃত্ব দেন প্রাচ্যের বড় বড় পণ্ডিত, লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোল্ড যোহের, যোসেফ, আলফ্রেড হিউম, এম গ্রীন, ফিলিপ হিট্রি, আলফ্রেড জিওম প্রমুখ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুনকিরে হাদীছ তথা হাদীছ অস্বীকারকারী 'আহলে কুরআন' আন্দোলনের মূলে পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব দেন চেরাগ আলী, আহমাদ দ্বীন অমৃতসরী, আসলাম জয়রাজপুরী, গোলাম আহমাদ পারভেজ প্রমুখ। ভারতীয় উপমহাদেশে তারা তাদের এই নব্য ফেতনাকে বিকশিত ও সকলের নিকটে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে হাতে কলম তুলে নেয় এবং লেখনী শক্তিতে তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা চালায়। যেমন—

(১) আব্দুল্লাহ যাকরালভী: যিনি সুন্নাহ তথা হাদীছকে শরীআতের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে একেবারে অস্বীকার করেন। হাদীছ শরীআতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং দ্বীনের যেকোনো বিষয়ে হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে তিনি মন্তব্য করতেন। তিনি কলম ধরেন এবং 'ইশাআতুল কুরআন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

* দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা; শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

(২) আহমাদ দ্বীন অমৃতসরী: আহমাদ দ্বীন অমৃতসরী হলেন আব্দুল্লাহ যাকরালভী এর অনুসারী, সহযোগী এবং আহলে কুরআন মিশনের অন্যতম কর্ণধার। যখন আব্দুল্লাহ যাকরালভী মৃত্যুবরণ করে, তৎপরবর্তী সে এই হাদীছ অস্বীকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। মূলত সে ছিল অমৃতসরের অধিবাসী। সে 'উম্মাতু মুসলিমা' নামে একটি জামাআত প্রতিষ্ঠা করে এবং কুরআনের অপব্যাখ্যার চেষ্টা করে একটি তাফসীর লিখে 'ইশাআতুল কুরআন' নামে। তার দাবি ছিল কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আর হাদীছকে বর্জন করা।

(৩) আসলাম জয়রাজপুরী: হাদীছ অস্বীকার আন্দোলনের পতাকাবাহীদের অন্যতম ব্যক্তি হলেন আসলাম জয়রাজপুরী। মূলত তিনি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করতেন, বর্তমানে এই যুগে হাদীছের প্রয়োজন নেই।

(৪) গোলাম আহমাদ পারভেজ: ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীছ অস্বীকার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন গোলাম আহমাদ পারভেজ। আসলাম জয়রাজপুরী ও গোলাম আহমাদ পারভেজ উভয়ে মিলে এই মিশনকে সফল করার জন্য 'তুলূউল ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারা এই পত্রিকা প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলাম এবং মুসলিমদের। তাদের এই পত্রিকার দাবি ছিল, এখন হাদীছের অনুসরণ প্রয়োজন নেই। আধুনিক যুগে সেই আগের তথা প্রাচীনকালের হাদীছ অনুসরণ নিষ্প্রয়োজন। এজন্য তারা ১৯৩৮ সালে এই পত্রিকা প্রকাশ করে।

(৫) মাওলানা মওদূদী: মাওলানা মওদূদী হলেন জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা। মূলত তিনি পুরোপুরি হাদীছকে অস্বীকার না করলেও হাদীছের উপর ছিল তার অগাধ সংশয়, সন্দেহ। তার দাবি ছিল হাদীছ সংকলন, ছহীহ-যঈফ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে। এমনকি তিনি খবরে আহাদ হাদীছকে অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করতেন। তিনি হাদীছের ব্যাপারে সংশয়বাদী ছিলেন এবং এর ব্যাপারে যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য লালন করতেন (দ্র. মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী রহিমাহুল্লাহ-এর একটি পত্রের জবাব)।

আহলে কুরআনের ফেতনা প্রতিরোধে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেমগণের অবদান:

হাদীছ অস্বীকার মিশন এবং হদীছের বিষয়ে সংশয়বাদী করে তোলার ফেতনাকে খুবই শক্তভাবে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেম সম্প্রদায় পৃথিবীর ইতিহাসে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইলমী অবস্থানে তাদের সে যুগোপযোগী প্রতিরোধের তীব্র স্রোতে আহলে কুরআনের নেতা, লেখনী, পত্রিকা মুখ থুবড়ে পড়ে। সুন্নাহ তথা হাদীছ ইসলামী শরীআতের হুজ্জাত তথা দলীল এবং দ্বীন ইসলামের অন্যতম অংশ। এটা সাব্যস্ত করার জন্য আহলুল হাদীছ ও হানাফী মাযহাবের আলেমগণ সমন্বিতভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তাদের সমন্বিত প্রতিরোধে তোপের মুখে পড়ে হাদীছ অস্বীকারকারীরা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী রহিমাহুল্লাহ-এর অন্যতম ছাত্র মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী রহিমাহুল্লাহ, তিনি 'আহলে কুরআন'-এর বিরুদ্ধে দাঁতভাঙা জবাবস্বরূপ পত্রিকা প্রকাশ করেন 'ইশাআতুস সুন্নাহ' নামে। যেটি প্রকাশিত হয় ১৯০২ বা ১৯০৩ সালে। মূলত এটি আহলে কুরআনের 'ইশাআতুল কুরআন'-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী রহিমাহুল্লাহ বীর যোদ্ধার মতো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলেন 'আহলে হাদীছ' পত্রিকার মাধ্যমে। 'কিতাবু ছিয়ানাতুল হাদীছ' শিরোনামে বই লিখেন আব্দুর রঊফ ঝান্ডাগড়ী রহিমাহুল্লাহ। এমনিভাবে 'মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম' শিরোনামে বই লিখেন মুহাম্মাদ ইসমাঈল আস-সালাফী রহিমাহুল্লাহ। ঠিক তেমনি 'নুছরাতুল হাদীছ' নামে বই লিখেন শায়খ হাবীবুর রহমান আযমী রহিমাহুল্লাহ। এমনিভাবে পরবর্তীতে মুহাম্মাদ ইসমাঈল আস-সালাফী রহিমাহুল্লাহ প্রতিবাদ এবং প্রত্যুত্তর জানান 'হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' বই লিখে এবং প্রখ্যাত বিতার্কিক শায়খ আহসান আল-কায়লানী রহিমাহুল্লাহ লিখেন 'তাদবীনুল হাদীছ'। এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের আলেম সম্প্রদায় হাদীছ অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সর্বদিক থেকে প্রতিবাদ করেন এবং তাদের বাতিল চিন্তা ও মতবাদকে নাস্তানাবুদ করার লক্ষ্যে বক্তব্য, লেখনী ছাড়াও জনসাধারণের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেন, যাতে কেউ যেন তাদের এই বাতিল আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে। আধুনিক যুগেও অনেকেই লিখছেন ও বলে যাচ্ছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে কুরআনের এই মিশন বেশি পুরনো ইতিহাস না হলেও তাদের এই আন্দোলন যে কত সূদূরপ্রসারী এবং আমাদের ইসলাম ও মুসলিম জীবনকে কত যে প্রশ্নবিদ্ধ করছে তা বর্তমান সময়ে সহজেই অনুমেয়। কেননা হাদীছের উপর সংশয় সৃষ্টি মানেই ইসলামী শরীআতের উপর সংশয় সৃষ্টি করা। ফলে খুব সহজেই ইসলামের মূল বৃত্ত থেকে যেকোনো মুসলিমকে সরিয়ে আনা সহজ আর এটাই করে যাচ্ছে হাদীছ অস্বীকারকারীরা। তাই আমাদেরকে এমন লেবাসধারী, নেক ছুরতে আগমনকারী আহলে কুরআন থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং তাদের কথিত যুক্তি, বক্তব্যকে এড়িয়ে চলে কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা ফেতনা এভাবেই এসে আমাদের ঈমানকে চুরি করবে। তাই ফেতনার এই বীভৎস ঘনঘটায় কুরআন, সুন্নাহ আর সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণেই আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ আমাদের সঠিকটা বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

বিদআত ও তার কুফল

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

‘বিদআত’ আরবী শব্দ, এর অর্থ নতুনভাবে সৃষ্টি করা। এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ‘তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা’ *(আল-বাক্বারা, ২/১১৭)*। শরীআতের দৃষ্টিতে বিদআত হচ্ছে ঐ সমস্ত বিশ্বাস, কথা ও আমল, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়; অথচ তার সমর্থনে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোনো বর্ণনা বা দলীল নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ ‘তাদের কি এমন কোনো অংশীদার আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেননি’ *(আশ-শূরা, ৪২/২১)*।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামী শরীআত রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর আগেই আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এতে সংযোজন ও বিয়োজনের কোনো অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম’ *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ ‘অবশ্যই আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট দ্বীনের ওপর ছেড়ে যাচ্ছি, যার রাত্রিও দিনের মতোই। আমার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না’।[১] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, اِتَّبِعُوْا وَلَا تَبْتَدِعُوْا؛ فَقَدْ كُفِيْتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيْقِ ‘তোমরা (কুরআন-সুন্নাহর) অনুসরণ করো, নতুন কিছু রচনা করো না। কারণ তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। আর তোমরা পুরাতন পন্থাই অবলম্বন করো’।[২]

দ্বীনের মধ্যে নতুন চালুকৃত সকল বিশ্বাস, কথা ও কর্মই বিদআত। আর সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা। সকল বিদআতী আমল অগ্রহণযোগ্য এবং বিদআত সৃষ্টিকারী ও পালনকারীকে গোমরাহ বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ‘দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কারণ এই জাতীয় প্রতিটি সংযোজনই বিদআত আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা’। নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ‘আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[৩]

বিদআতীকে সাহায্য করা ও আশ্রয় দেওয়া ব্যক্তি লা‘নত পাওয়ার যোগ্য: রাসূল ﷺ বলেন, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ‘যে ব্যক্তি কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাকে লা‘নত করেন’।[৪]

যেখানে বিদআত চালু হয়, সেখান থেকে সুন্নাত বিদায় নেয়: হাসান ইবনু আতিয়্যাহ আল-মুহারিবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‘কোনো সম্প্রদায় যখন তাদের দ্বীনের মধ্যে কোনো বিদআত আবিষ্কার করে, তখন আল্লাহ তাদের সুন্নাত থেকে সমপরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। অতঃপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে তিনি আর সেই সুন্নাত ফেরত দেন না’।[৫]

বিদআতকারীর তওবা তার বিদআত করা অবস্থায় আল্লাহ কবুল করেন না: রাসূল ﷺ বলেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ ‘নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবাকে আটকিয়ে রাখেন (যতক্ষণ সে বিদআত পরিত্যাগ না করে)’।[৬] এর কারণ হলো, বিদআতী যে বিদআত করে, তা ছওয়াবের কাজ ভেবেই করে। তাই সে যখন কোনো গুনাহ থেকে তওবা করে, তখন আল্লাহ তার দিকে কর্ণপাত করেন না।

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. আহমাদ, হা/১৭১৪২; ইবনু মাজাহ, হা/৪৩, হাদীছ ছহীহ।

২. আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ. ৪২।

৩. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; নাসাঈ, হা/১৫৭৮; মিশকাত, হা/১৬৫, হাদীছ ছহীহ।

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৮; মিশকাত, হা/৪০৭০।

৫. দারেমী, হা/১০৫; মিশকাত, হা/১৮৮, হাদীছ ছহীহ।

৬. ত্বাবারানী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৪২০২, হাদীছ ছহীহ।

বিদআত সৃষ্টির কারণসমূহ:

(১) ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান না থাকার কারণে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং ইলম বা জ্ঞান ছাড়া ফতওয়া দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ‘আর সে বিষয়ের পেছনে ছুটো না, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। কান, চোখ আর অন্তর-এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ‘একজন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (কোনো যাচাই ছাড়াই) তাই বলে বেড়াবে’।[৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ‘আল্লাহ তাআলা ইলম বা জ্ঞানকে তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না, বরং আলেমদেরকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। তারপর যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন লোকজন অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (মাসআলা, ফতওয়া) জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তারা বিনা জ্ঞানেই ফতওয়া দিবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যদেরকেও বিপথগামী করবে’।[৮] তাই কোনো কিছু বলা ও আমল করার পূর্বে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করাকে ইসলাম ফরয করেছে। রাসূল ﷺ বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের ওপর দ্বীন শিক্ষা করা ফরয’।[৯]

(২) নিজেদের ইমাম ও তথাকথিত ওলীদের অন্ধ অনুকরণ, তাক্বলীদ ও পক্ষপাতিত্ব করা: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ‘তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যা করতে দেখেছি, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুই জানত না এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না’ *(আল-মায়েদা, ৫/১০৪)*।

(৩) বিজাতীয়দের অনুকরণ করা: রাসূল ﷺ বলেছেন, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে’।[১০] যেমন— কবরে ফুল দেওয়া, নীরবতা পালন করা, জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, শোকদিবস, ঈদে মীলাদুন নবী দিবস পালন করা ইত্যাদি।

(৪) জাল-যঈফ ও দুর্বল হাদীছের ওপর ভিত্তি করে আমল করা: আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার কিতাবে বলেছেন, এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই মানুষকে আহ্বান করি যে, যঈফ হাদীছের প্রতি কখনো আমল করা যাবে না, না ফাযায়েল ও মুস্তাহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ যঈফ হাদীছ কোনো বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা জন্মায় মাত্র, যা নিশ্চিতরূপে রাসূল ﷺ-এর বাণী নাও হতে পারে।[১১]

(৫) বিদআতী কর্মকাণ্ডের ওপর আলেমদের নীরব থাকা এবং উক্ত কাজে তাদের শরীক হওয়া: আলেমদের উচিত, যার যার সাধ্য অনুযায়ী সঠিকটা প্রচার করা এবং অসত্য ও মিথ্যাকে প্রতিহত করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৪)*। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে। তাও যদি না করতে পারে, তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান’।[১২]

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৫; মিশকাত, হা/১৫৬।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১০০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৩; মিশকাত, হা/২০৬।
৯. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪; মিশকাত, হা/২১৮, হাদীছ ছহীহ।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৯; মিশকাত, হা/৫৩৬১।
১১. আলবানী, ‘ছিফাতুছ ছালাত’-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯; মিশকাত, হা/৫১৩৭।

বিদআত প্রচলনকারী ও তার দিকে আহ্বানকারীর গুনাহের পরিমাণ: জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো মন্দ রীতি (বিদআত কিংবা কুসংস্কার) চালু করল, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই; উপরন্তু যারা এ মন্দ রীতির ওপর আমল করবে, তাদের জন্য তার গুনাহও তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আমলকারীর গুনাহ কোনো কম করবে না'।[১৩] আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভ্রষ্টতার দিকে ডাকল, তার সে পরিমাণ গুনাহ হবে, যতটুকু গুনাহ তার অনুসারীদের জন্য হবে। অথচ এ কারণে অনুসারীদের গুনাহকে এতটুকুও কমাবে না'।[১৪]

বিদআতীদের অবস্থা ও তাদের আমলের ফলাফল:

আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 'বলুন! আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাবো, যারা আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে' *(আল-কাহফ, ১৮/১০৪-১০৫)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ 'আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে (হিসাব নেওয়ার জন্য) অগ্রসর হব, অতঃপর (তাদের আমল শর্তানুযায়ী না হওয়ার দরুন) সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের বিষয়ে এমন আমল বা কর্ম করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য হিসেবে বিবেচিত হবে'।[১৫]

পরকালে বিদআতীরা যা বলবে, আল্লাহ সে কথা উল্লেখ করে বলেন, ﴿يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا - وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا - رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ 'তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলকে মানতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা-ইমামদের ও বড় বড় লোকদের (পীরদের) আনুগত্য করেছিলাম। সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিশাপে অভিশাপ দাও' *(আল-আহযাব, ৩৩/৬৬-৬৮)*।

বিদআতীদেরকে ক্বিয়ামতের দিন হাওযের পানি পান করা হতে বাধা দেওয়া হবে: ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাওযের নিকট অবস্থান করবেন এবং তাঁর উম্মতকে পানি পান করাবেন। আর বিদআতীরা যখন পানি পান করতে আসবে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে বাধা দিবে আর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তারা জানিয়ে দিবেন যে, আপনি জানেন না, আপনার মৃত্যুর পর তারা কত বিদআত সৃষ্টি করেছে। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي 'যারা আমার মৃত্যুর পর শরীআতের মধ্যে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক! তারা দূর হোক!'।[১৬]

সমাজে প্রচলিত বিদআতী আমলের কিছু নমুনা:

(১) ঈদে মীলাদুন নবী উদযাপন করা ও মীলাদ-ক্বিয়াম করা।

(২) শবেবরাত ও শবে মি'রাজের রাতে বিশেষ ইবাদত করা ও দিনে ছিয়াম রাখা।

(৩) শোক দিবস পালন করা।

(৪) মৃত ব্যক্তির জন্য হাফেযে কুরআন ডেকে কুরআন খতম, দু'আ ইউনুস খতম ইত্যাদি করানো।

এছাড়াও আরও অনেক আমল আমাদের সমাজে চালু রয়েছে, যার দলীল কুরআন-সুন্নাহতে ও ছাহাবীদের আমলেও নেই; অথচ আমরা তা ছওয়াবের আশায় করে থাকি। অতএব, আমাদেরকে আমলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যথা অর্থ, সময় ও পরকাল সবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৭; মিশকাত, হা/২১০।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪; মিশকাত, হা/১৫৮।
১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬; মিশকাত, হা/৫৫৭১।

কেন আল্লাহর ইবাদত করব

-সাঈদুর রহমান*

কিছু মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে আর কিছু মানুষ করে না। যারা আল্লাহর ইবাদত করে না তারা বলে, কেন আল্লাহর ইবাদত করব? কেন আমরা তাঁর কথা শুনব? তিনি আমাদের এমন কী দান করেছেন, যার জন্য তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য হব? প্রথমেই আপনাকে একটা কথা বলি- আপনি যদি আল্লাহর ইবাদত না করেন, তাহলে এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আপনি আল্লাহর ইবাদত না করলে তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি গোটা পৃথিবীর সবাই যদি আল্লাহর কথা না শুনে মূর্তিপূজা করে, তাতেও তিনি কোনো পরোয়া করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ ‘তোমরা ও গোটা পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী করো, তাহলে জেনে রাখো নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সপ্রশংসিত’ *(ইবরাহীম, ১৪/৮)*।

গোটা পৃথিবীর সকল মানুষ যদি কাজকর্ম বাদ দিয়ে সিজদায় পড়ে থাকে, তাহলেও আল্লাহর যে সম্মান আছে এতে বিন্দু পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। আর সকল মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিপূজা শুরু করে, তাহলে এতে আল্লাহর যে সম্মান আছে তার বিন্দু পরিমাণও কমবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ ‘আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী আর তোমরা হলে মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্যদের নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ ‘বলুন, যদি তোমরা না-ই ডাকো, তাহলে আমার রব তোমাদের কোনো পরওয়া করেন না’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৭)*। নবী করীম ﷺ বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ‘আল্লাহ তাআলার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না’।[১]

আরও একটা কথা শুনে রাখুন, আমরা যদি আল্লাহর ইবাদত না করি, তাঁর কাছে মাথা নত না করি, তাহলে তিনি আমাদের শাস্তি দিয়ে মৃত্যু দিবেন। তারপর আমাদের বাদে ভিন্ন এক প্রজন্ম নিয়ে আসবেন, যারা আমাদের মতো হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মাঝে কেউ বেদ্বীন হয়ে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, তিনি যাদের ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর’ *(আল-মায়েদা, ৫/৫৪)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ ‘তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পরিবর্তে অন্যদের নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৮)*।

তিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করতে কখনো বাধ্য করবেন না। আমাদেরকে শুধু জান্নাতের ও জাহান্নামের পথ বাতলে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ‘আমরা তাকে দুটি পথ (ভালোমন্দ) দেখিয়েছি’ *(আল-বালাদ, ৯০/১০)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ‘আমরা তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। হয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, নয়তো অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে’ *(আদ-দাহর, ৭৬/৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ‘বলুন, সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, যার ইচ্ছা কুফরী করবে’ *(আল-কাহফ, ১৮/২৯)*।

তিনি যদি আমাদের বাধ্য করেন, তাহলে তো তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য। যদি বাধ্য করা হয় ঈমান আনার জন্য, তাহলে তো এটা পরীক্ষা থাকছে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ‘তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মাঝে কার আমল সুন্দর’ *(আল-মুলক,৬৭/২)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ ‘তিনি তোমাদের একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তা দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য’ *(আল-আনআম, ৬/১৬৫)*।

আমরা তাঁর ইবাদত করব নিজেদের ভালোর জন্য। তাঁর কথা শুনলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ‘তোমরা কর্ম করার কারণে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো’ *(আয-যুখরুফ, ৪৩/৭২)*।

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে দাসত্বের গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। হয় সে আল্লাহর দাসত্ব করবে, নচেৎ অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দাসত্ব করবে। এখন আপনার সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা হলে আল্লাহর দাসত্ব করবেন আর ইচ্ছা না হলে করবেন না,

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তিরমিযী, হা/২৩২০, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

বরং মনের অজান্তেই অন্যের দাসত্ব করবেন। কেউ দাসত্ব করে টাকাপয়সার, কেউ দাসত্ব করে নারীর, কেউ দাসত্ব করে ক্ষমতার, কেউ দাসত্ব করে প্রতাপশালী দাপুটে ব্যক্তির, আবার কেউ দাসত্ব করে আল্লাহর। আমরা আল্লাহর দাসত্ব না করলে তিনি আমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতি নিয়ে আসবেন যারা তাঁর দাসত্ব করবে। আপনি প্রায় শুনতে পান, অমুক জায়গায় এক হিন্দু পরিবার ইসলাম কবুল করেছে, অমুক খ্রিষ্টান মুসলিম হয়েছে, অমুক বেদ্বীন দ্বীনে ফিরে এসেছে; তখন আপনি একবারের জন্যও ভাবনার পৃষ্ঠাটা উল্টিয়ে দেখেন না, কেন এমন হলো? এভাবেই আমরা আল্লাহর দাসত্ব না করলে তিনি অমুসলিমদের মুসলিম বানাবেন, যারা তাঁর দাসত্ব করবে। ক্ষতিটা কিন্তু আল্লাহর হচ্ছে না, ক্ষতিটা আমার আপনার হচ্ছে। আপনি যদি আল্লাহর ইবাদত না করেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দুটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আপনি মৃত্যুকে ঠেকান। মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সব চেষ্টা-তদবির করুন, দেখুন বাঁচতে পারেন কি-না। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন,﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ 'বলুন, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে মৃত্যুকে প্রতিহত করো' *(আলে ইমরান, ৩/১৬৮)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ 'প্রতিটি প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো' *(আন-নিসা, ৪/৭৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ 'হে নবী! বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা তোমাদের সম্মুখীন হবেই' *(আল-জুমুআ, ৬২/৮)*।

আল্লাহ দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ করেছেন যদি তাঁর দাসত্ব করতে ভালো না লাগে, তাহলে এই আসমানের নিচ থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। এই আসমান তো আল্লাহর। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ 'হে জিন ও মানুষেরা! আসমান ও যমীনের সীমানা থেকে বের হয়ে যেতে পারলে তোমরা বের হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা বের হতে পারবে না। সব জায়গায় রয়েছে তাঁর রাজত্ব' *(আর-রহমান, ৫৫/৩৩)*।

এখন আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এই আসমানের নিচ থেকে চলে যান দেখি! কখনো পারবেন না। যেখানে যাবেন, সেখানেই দেখবেন আল্লাহর রাজত্ব। এ কথাটাই তিনি কুরআনে এভাবে বলেছেন, ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ 'আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত তারা কি অন্য দ্বীনের প্রত্যাশী। অথচ স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আসমান-যমীনের সবাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর সমীপেই তাদের ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান, ৩/৭৩)*।

তিনি আপনাকে আরো কিছু চ্যালেঞ্জ করছেন। তিনি বলছেন, আমার বান্দা! তুমি যদি আমার ইবাদত ও দাসত্ব না করো, তুমি যদি আমাকে একক হিসেবে বিশ্বাস না করো; তাহলে তুমি বলো তো তুমি কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? উহুঁ, বুঝতে পারছি এটা আপনি জানেন না। আচ্ছা বলুন তো, কখন বৃষ্টি হবে? এটাও তো জানেন না। মায়ের পেটে পূর্ণ বাচ্চা আছে নাকি অপূর্ণ বাচ্চা আছে বলুন তো দেখি? এটাও জানেন না, তাহলে জানেন কী? আল্লাহ তো সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন ও পশ্চিম দিকে ডুবিয়ে দেন। আপনি এর বিপরীত করুন তো? কখনোই পারবেন না। আপনি আল্লাহর সাথে কখনোই পেরে উঠবেন না।

এখন কথা হচ্ছে, আমরা কেন আল্লাহর ইবাদত করব, তিনি আমাদের এমন কী নেয়ামত দান করেছেন যে, যার দরুন তাঁর দাসত্ব করতে হবে! তাহলে শুনুন কেন তাঁর ইবাদত করতে হবে। আপনি তো মাঝেমধ্যে ঢাকা শহরে কোনো কাজে অবশ্যই যাতায়াত করেন। রাস্তার ধারে বা ফুটপাতে ভ্যানগাড়িতে দেখবেন অসুস্থ বিকলাঙ্গ কত লোক পড়ে আছে। শুক্রবারে বায়তুল মোকাররমে গেলে দেখতে পাবেন কত অসুস্থ বিকলাঙ্গ মানুষ মুছল্লীদের নিকট হাত পাতছে। ঢাকা মেডিকেল বা যে-কোনো হাসপাতালে গেলে দেখতে পাবেন আপনার চোখের সামনে কত মানুষ কাতরাচ্ছে। একবার কি আপনি চিন্তা করেছেন এই অসুস্থ বিকলাঙ্গ মানুষটা যদি আমি হতাম! আল্লাহ যদি আমাকে এর মতো করে সৃষ্টি করতেন, তাহলে আমার অবস্থাও এমন হতো। এই লোকটা যে অসুস্থ বিকলাঙ্গ, এই বিকলাঙ্গ হওয়ার পেছনে তার কি কোনো হাত আছে? কেউ কি বিকলাঙ্গ হতে চায়? আপনি যদি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে কাতরাতেন, তাহলে কেমন হতো! আল্লাহ তাআলা এত মানুষের ভিড়ে আপনাকে সুস্থ-সবল করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন, তারপরও কি আল্লাহর ইবাদত করবেন না? ওই বিকলাঙ্গ লোকটার কী দোষ? সে তো নিজে এমন হতে চায়নি। একটু বিবেকের দরজায় কড়া নাড়া দিন। সবকিছু আপনার সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে। আপনি কি একবারও চিন্তা করেছেন, যখন আপনি ছোট্ট শিশু ছিলেন, এপাশ থেকে ওপাশ হতে পারতেন না, নিজ ঘাড়টা কাত হয়ে থাকলে সোজা করতে পারতেন না, বিছানায় প্রস্রাব-পায়খানা করে দিতেন, নিজ কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারতেন না, ক্ষুধা লাগলে মায়ের কাছে চাইতে পারতেন না, মশা কামড় দিলে বা মাছি বিরক্ত করলে কিছু বলতে পারতেন না, ওই অসহায় ও অতিশয় দুর্বল মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মা নামক বটবৃক্ষ দিয়ে সংরক্ষণ করেছেন! ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন ছটফট করতেন, রোদের তাপে কষ্ট অনুভব করতেন, মশা-মাছির জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতেন, তখন মা নামক বটবৃক্ষ আপনার কান্নার শব্দ পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। আপনাকে সান্ত্বনার শীতলতায়

আচ্ছাদিত করার জন্য যারপরনাই কোশেশ করতেন। আপনার জন্য কত রাত যে বিনিদ্র যাপন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কোন স্বার্থে আপনার মা আপনার সাথে এমন কোমল আচরণ করেছেন? ওই সময় তো আপনি তাকে টাকাপয়সাও ইনকাম করে দেননি যে, আপনার প্রতি আলাদা একটা টান থাকবে! আল্লাহ তাআলা আপনার মায়ের হৃদয়ের মণিকোঠায় আপনার প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা ও টান সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার দরুন শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে আপনার মা আপনার কাছে ছুটে আসতেন! এভাবেই আপনি ধীরে ধীরে প্রাপ্তবয়সে উপনীত হলেন। এখন আপনার বয়স ২৫। আপনার শরীরে বইছে তারুণ্যের মনমাতানো হাওয়া। আশপাশে সবকিছুই আছে আগের মতো। মা ঠিকমতো খোঁজখবর নিচ্ছেন, বাবা আগের মতোই ভালোবাসেন। তথাপি মনটা কেন জানি ভালো লাগে না। কী জানি একটা শূন্যতা অনুভব করেন। সবার সাথে হাসিখুশি থাকলেও হৃদয়টা কেন জানি কারো জন্য সদাসর্বদা সাগ্রহে বসে থাকে। আমি আপনার হৃদয়ের অস্থিরতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঠাহর করতে না পারলেও আমার আপনার পরম রব ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। তিনি মা-বাবার মনে ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন, তোমার ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করাতে হবে। ঘটা করেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল। আপনি এখন ভীষণ সুখী। এতদিনের না বলা কথামালা একজনের সাথে বিনা সংকোচে বলতে পারেন, আপনার গোপন বিষয়গুলো সে সযতনে লুকিয়ে রাখে, কারো কাছে বলে না। আপনার জীবনটাই এখন এক মিষ্টি বউ দিয়ে আনন্দময় হয়ে উঠেছে। এভাবেই চলছে বছর খানেক। এখন দেখা যাচ্ছে বউ এর সাথে ভালোবাসা আগের তুলনায় খানিকটা কমে গেছে। আগে যেমন এক মুহূর্ত না দেখলে ছটফট করতেন, কোথাও থেকে এসে তাকে না পেলে ঘরদোর মাতিয়ে তুলতেন, এখন এমনটা কেন জানি হয় না। ঠিক ওই মুহূর্তে আপনার জীবনটা আরো সুখময় ও প্রাণবন্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করলেন চোখ জুড়ানো ফুটফুটে একটা ছেলে বা মেয়ে সন্তান। আপনার স্ত্রীর শূন্য কোল পুরা হলো এই সন্তান নিয়ে। আপনার মা-বাবা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর হলো। এখন আপনি আপনার সন্তানের চেহারার দিকে তাকিয়ে শান্তি অনুভব করেন। আপনার সন্তানের চেহারায় আপনার মা-বাবার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। বারবার বলেন, এটাই আমার মা, এটাই আমার বাবা। দিনে কতবার যে সন্তানের মুখ থেকে অস্ফুট আব্বু আম্মু ডাক শুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন! আপনি নিজেও কতবার যে আব্বু আম্মু বলে ডাকেন আল্লাহই ভালো জানেন। কাজ থেকে এসেই হাত থেকে ব্যাগ রেখে আগে পরখ করেন প্রিয় সন্তানের মুখ। কত প্রশান্তি যে অনুভব করেন, তা শুধু আপনিই অনুভব করেন। নিজে না খেয়ে না পরে থাকতে পারেন, কিন্তু আদরের সন্তানের জন্য চাওয়ার আগেই সব প্রস্তুত। এভাবেই সন্তান বড় হয়ে যায়।

এখন তাকে আগের মতো একটা ভালো লাগে না। কিছুদিন পর তার জন্য ফুটফুটে একটা বউ আনলেন। তাদের থেকে এক সন্তান হলো। এখন নাতি-নাতনি নিয়ে বেশ আনন্দ-ফুর্তিতে আছেন। একবেলা তাদের না দেখলে পেটের ভাত হজম হয় না। কোথাও বেড়াতে গেলে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসতে তাগিদ দেন। জীবনটা এখন শূন্য নয়। সবসময় প্রাণবন্ত থাকেন। নাতি-নাতনিদের সাথে খুনশুটি আর খোশগল্পে দিনটা কখন যে কেটে যায়! আল্লাহ তাআলা এসব কিছু আমাকে আপনাকে দিয়েছেন। তারপরও কি আল্লাহর ইবাদত করব না? এগুলো কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত নয়? জানেন কত মানুষের বাচ্চা হয় না। তারা তো হাজারো চেষ্টা-তদবির করছে। তারা কী দোষ করেছে? আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে না চাইতেই ফুটফুটে সুন্দর সন্তান দান করলেন। এটা কি আল্লাহর নেয়ামত নয়? আল্লাহ তাআলা আমাদের আরো কত নেয়ামত দিয়েছেন দেখুন। যে জিনিসের আমাদের বেশি প্রয়োজন, সেই জিনিসটা আমরা অতি স্বল্প মূল্যে পাই। যেমন অক্সিজেনের কথা বলি। অক্সিজেন ছাড়া মানবদেহ এক মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। জলে-স্থলে যেখানেই থাকুন না কেন অক্সিজেন থাকতেই হবে। নচেৎ আপনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। অক্সিজেন যেহেতু মানবদেহের জন্য অপরিহার্য একটা বিষয়, সেহেতু আল্লাহ তাআলা এই সবচেয়ে দামি সম্পদটা আমাকে আপনাকে ফ্রি ফ্রি অবিরত দিয়ে যাচ্ছেন। এই অক্সিজেনের কত যে মূল্য তা আপনি বুঝতে পারবেন, কখনো আইসিইউ এর মধ্যে গেলে –আল্লাহ আপনাকে হিফাযতে রাখুন-। আইসিইউ এর মধ্যে আপনাকে একদিনের জন্য অক্সিজেন দেওয়ার জন্য নেওয়া হলে দেখবেন আপনার বিল হচ্ছে লাখ খানেক টাকা। এখন আপনি হিসেব করুন একদিনে যদি অক্সিজেন গ্রহণ করে এক লাখ টাকা দিতে হয়, তাহলে ৬০-৭০ বছর যে জীবিত ছিলেন এর জন্য কত টাকা খরচ হতো! আল্লাহ তাআলা এই সম্পদটা আমাদের ফ্রি দিয়েছেন। এরপর মানুষের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পানির। আল্লাহ তাআলা এই জিনিসটাও স্বল্প মূল্যে আমাদের দান করেছেন। অনায়াসে ভূগর্ভ থেকে পানি অবিরাম উঠছে। আল্লাহ তাআলা যদি এই পানি আটকে রাখতেন কে আমাকে আপনাকে সুপেয় পানি দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ ‘বলুন, তোমরা আমাকে বলো, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদের প্রবাহমান পানি এনে দেবে? *(আল-মুলক, ৬৭/৩০)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ - أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ - لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ ‘তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে আমাকে জানাও। তোমরা কি সেটা মেঘ থেকে বর্ষণ করেছ নাকি আমরা বর্ষণ করেছি? আমরা ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তথাপি তোমরা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? *(আল-ওয়াক্বিয়া, ৫৬/৬৮-৭০)*।

পানি নামক এই বড় নেয়ামতটা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন কখন জানেন? যাদের পাম্প আছে অর্থাৎ পাম্পের মাধ্যম পানি উঠান, চাপ কল নেই তাদের যদি দুয়েক দিন বিদ্যুৎ না থাকে, তাহলে হাড়েহাড়ে টের পাবেন পানির যে কত মূল্য! ঢাকায় যারা অবস্থান করেন, তারা মাঝেমধ্যে বিষয়টা আঁচ করতে পারেন।

এরপর আসি আগুন প্রসঙ্গে। আমাদের প্রতিটা কাজে আগুনের প্রয়োজন। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে কলকারখানায় আগুন ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। দোকান থেকে দুই টাকা দিয়ে একটা দিয়াশলাই কিনবেন, ১ মাস যাবে। এই আগুন ও জ্বালানি কিন্তু আমরা সৃষ্টি করিনি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ - أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ ‘তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত করো, সে সম্পর্কে আমাকে জানাও। তোমরা কি এর গাছ সৃষ্টি করেছ নাকি আমরা সৃষ্টি করেছি? *(আল-ওয়াক্বি‘আহ, ৫৬/৭১-৭২)*।

দেখলেন আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস কত স্বল্প মূল্যে দান করলেন! তারপরও কি আমি আপনি আল্লাহর ইবাদত করব না?

আমরা যে যমীন থেকে উৎপাদিত ফসল খাই, এই ফসলও আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ - لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ ‘তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি সেটা অঙ্কুরিত করো নাকি আমরা অঙ্কুরিত করি? আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতভম্ব হয়ে যাবে’ *(আল-ওয়াক্বি‘আহ, ৫৬/৬৩-৬৫)*।

আমাদের দেহে কত মূল্যবান সম্পদ যে আল্লাহ তাআলা না চাইতেই দিয়েছেন তা আপনি জানেন না। আপনাকে বলছি কিছু সম্পদের কথা। নবী করীম ﷺ বলেন, فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ ‘প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট দিতে হবে’।[২] অন্যত্র নবী করীম ﷺ বলেন, الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ‘সবগুলো আঙুলের (দিয়াত) সমান। প্রতিটি আঙুলের দিয়াত ১০টি করে উট’।[৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের দাঁত দিয়েছেন চিবিয়ে খাওয়ার জন্য। কেউ যদি এই দাঁত ভেঙে ফেলে, তাহলে ওই ব্যক্তিকে একটি দাঁত ভাঙলে পাঁচটি উট ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাহলে আপনি হিসেব করুন ৩২টি দাঁতের মূল্য হচ্ছে ১৬০টি উট। একটা উটের দাম যদি ৫ লাখ টাকা করে হয়, তাহলে কত টাকা আপনিই হিসাব করুন। আপনার দাঁত না থাকলে তো হাজারো টাকা খরচ করে দাঁত লাগান। আল্লাহ তাআলা এমনিতেই আপনাকে দাঁত দিয়েছেন! আপনার দুইটা চোখের মূল্য হচ্ছে ১০০টি উট। নাকের মূল্য হচ্ছে ৫০টি উট। একটা আঙুলের মূল্য হচ্ছে ১০টি উট। তাহলে পাঁচটি আঙুলের মূল্য হচ্ছে ৫০টি উট। হাত-পায়ের মোট আঙুল হচ্ছে ২০টি, তাহলে ২০টি আঙুলের মূল্য হচ্ছে ২০০টি উট। দুইটা হাতের মূল্য হচ্ছে ১০০টি উট এবং দুইটা পায়ের মূল্য হচ্ছে ১০০টি উট। এত মূল্যবান সম্পদ আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বিনামূল্যে দিয়েছেন! তারপরও কি আল্লাহর ইবাদত করবেন না?

আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীটা সাজিয়েছেন মনোরম করে। গাছে গাছে পাখপাখালির কলকাকলি, সরোবর ভর্তি মাছ, নদীর পানির ছলাত ছলাত কলতান, জোছনাভরা পূর্ণিমার চাঁদ, প্রাত্যহিক তারাদের মেলা, সোনালি রবি, মাঠে-তেপান্তরে জীবজন্তুর হুড়োহুড়ি, দূর আকাশের নীলিমা, মধ্য শ্রাবণে উতলা বর্ষণ- এসব দেখে, উপভোগ করে আমাদের হৃদয় আপ্লুত হয়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ঝিল্লিমুখর পরিবেশ, ঝিঁঝি পোকার ঝিঁ ঝিঁ ঝংকার, শীতের মধ্যভাগে রজনিতে হাসনাহেনার মৌ মৌ ঘ্রাণ, ঋতুরাজ বসন্তের পেলব স্নিগ্ধ পবন, আষাঢ়ের থেমে থেমে ইলশেগুঁড়ি বাদল, শরতের শুভ্র বলাকা সদৃশ আসমান- এসব আমাদের নয়ন জুড়ায়। আমরা কি আল্লাহর দেওয়া এই নেয়ামতগুলো ঠাহর করতে পারি? উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করেছি কোনোদিন?

আপাদমস্তক আমাদের পাপে ঘেরা, জীবন খাতার আদ্যোপান্ত ভুলে ভরা। তথাপি দয়াময় আমাদের জীবিকা দিয়ে যাচ্ছেন অবিরত। এখনো সময় আছে প্রিয়! রবের সমীপে ফিরে এসো। তাঁর ইবাদতে নিমগ্ন হও। নচেৎ তিনি পাকড়াও করলে কিন্তু রক্ষা নেই। এখনো বেলা ফুরাবার ঢের সময় বাকি। শেষ লগ্নে ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ-এর কয়েকটি হৃদয় জাগানিয়া উক্তির মাধ্যমে লেখার ইতি টানছি, ‘তুমি যদি মসজিদ ছেড়ে দাও, মসজিদে না আসো; তাহলে মসজিদ কিন্তু খালি থাকবে না। তোমার পরিবর্তে অন্য আরেকজন আসবে। তুমি যদি ছালাত ছেড়ে দাও, তাহলে অন্য আরেকজন ছালাত ঠিকই পড়বে। তুমি যদি কুরআন পড়ে ভুলে যাও, তাহলে অন্য আরেকজন কুরআন মুখস্থ করবে। কুরআন অনুযায়ী জীবন বাস্তবায়ন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করবে। তুমি যদি দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাও, তাহলে অন্য আরেকজন দ্বীনের বিধান দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরবে। মনে রেখো! এতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয়নি; বরং তুমি নিজেই নিজের ক্ষতি করলে। আল্লাহ তাআলা তোমার পরিবর্তে আরেকজন নিয়ে আসবেন, যে তোমার মতো অকৃতজ্ঞ হবে না’।[৪]

২. ইবনু মাজাহ, হা/২৬৫১, হাদীছ ছহীহ।

৩. ইবনু মাজাহ, হা/২৬৫৩, হাসান।

৪. মিফতাহু দারিস সায়াদা, ‘কুরআন’ অধ্যায়।

আল-কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াতের বিশেষ ফযীলত

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত ও সাথে সাথে বিশেষ কিছু সূরা বা আয়াতের প্রতি যত্নবান হওয়া মানুষকে অনেক বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-দুরাবস্থা এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করে। পৃথিবীতে সম্মানজনক, কল্যাণকর ও বরকতময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে তাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। কুরআন মাজীদ মূলত পৃথিবীর কঠিন ফিতনা, ভয়বহ বিপর্যয়, পাপ-পঙ্কিলতা ও অবক্ষয় থেকে মুক্তির নিরাপদ আশ্রয়স্থল, ভালো-মন্দের মাঝে শক্তিশালী ঢাল ও আদর্শময় জীবনের এক উত্তম পন্থা। যে তাকে জীবন চলার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করবে, তার জন্য তা রহমতস্বরূপ হবে। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে, নিঃসন্দেহে সে রহমত হতে বঞ্চিত হবে। কুরআনের এমন কিছু সূরা ও আয়াত আছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে খুব সহজেই সফল হতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

সূরা ফাতেহার ফযীলত :

সূরা ফাতেহার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ সূরা উম্মাতে মুহাম্মাদীর পূর্বে অন্য কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا فِى الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اَعْطِيْتُهُ.

উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। সূরা ফাতেহার ন্যায় অন্য কোনো সূরা তাওরাতে, ইঞ্জীলে, যাবূরে এমনকি ফুরক্বান তথা আল-কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি। আর এটা হলো, সাবয়ে মাছানী অর্থাৎ যা বার বার তেলাওয়াত করা হয়। আর এটাই কুরআনে আযীম, যা আমি প্রদত্ত হয়েছি'।[১]

সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করে আল্লাহর নিকট যা কিছু চাওয়া হয়, আল্লাহ তা দিয়ে থাকেন। আর সূরা ফাতেহা প্রত্যেক ছালাতের প্রত্যেক রাকআতে পড়তে হয়। যেমনটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَاَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ). قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِىْ عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ). قَالَ اللهُ تَعَالَى اَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ). قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ). قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ...

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি ছালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আমার বান্দা যা চায়, তাকে তা দেওয়া হয়। বান্দা যখন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দা বলে, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার গুণগান করেছে। আর বান্দা যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। তিনি আরও বলেছেন, বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সোপর্দ করেছে। আর বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝের বিষয়। আমার বান্দা যা চায়, তাকে তাই দেওয়া হবে...'।[২]

সূরা ফাতেহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করলে অসুস্থতা হতে আরোগ্য লাভ করা যায়। হাদীছে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সফররত অবস্থায় আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। একটি মেয়ে এসে বলল, নিশ্চয় এই বংশের সরদারকে সাপে দংশন করেছে। আমাদের লোকেরা অনুপস্থিত। তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে তাকে ঝাড়ফুঁক করবে? একজন তার সাথে চলে গেল অথচ আমরা কখনো জানতাম না যে, সে ঝাড়ফুঁক করে। কিন্তু সে ঝাড়ফুঁক করল এবং সরদার সুস্থ হলো। সরদার ঝাড়ফুঁককারীকে ৩০টি বকরি উপহার হিসাবে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিল; আমাদের দুধও পান করালো। যখন ঝাড়ফুঁককারী ফিরে আসল, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ভালো করে ঝাড়ফুঁক করতে জানো? বা বলা হলো যে, তুমি কি ঝাড়ফুঁক করো? সে বলল, না। আমি তো শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছি। বকরির ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এখন আমরা কিছু করব না, যতক্ষণ না আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করছি। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম, তখন আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কী করে জানলে যে, সূরা ফাতেহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? ঐ বকরিগুলো নিজেদের মধ্যে বণ্টন করো এবং আমাকে একটি অংশ দাও'।[৩]

সূরা বাক্বারা ও আলে ইমরানের ফযীলত :

ক্বিয়ামতের দিন সূরা বাক্বারা তার তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর নিকট দাবি করবে। হাদীছে এসেছে,

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. সুনানে তিরমিযী, হা/২৮৭৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২১৪২।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৯০৪।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২২০১।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اِقْرَءُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ.

আবু উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো। কেননা কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। দুটি আলোকময় সূরা তেলাওয়াত করো, আর তা হলো- সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে ইমরান। ক্বিয়ামতের দিন এই সূরা দুটি বাদলের ন্যায় বা ছায়ার ন্যায় আসবে, অথবা তা উড়ন্ত দুই ঝাঁক পাখির ন্যায় আসবে; সূরাদ্বয়ের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ নিয়ে দাবি করবে। তোমরা সূরা বাক্বারা অবশ্যই তেলাওয়াত করবে। কেননা তা তেলাওয়াত করা বরকত লাভের কারণ। আর তা তেলাওয়াত না করা কষ্টের কারণ। আর এ ক্ষেত্রে অলস ব্যক্তিরা সক্ষম হবে না’।[৪]

একই মর্মে নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

‘ক্বিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ আনা হবে। আর যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করত, তাদেরকেও আনা হবে। সূরা বাক্বারা এবং সূরা আলে ইমরান আগে আগে থাকবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুটি সূরার তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা আমি আজও ভুলিনি। ১. এই উভয় সূরা বাদলের দুটি টুকরার ন্যায় হবে। ২. দুটি কালো রং এর ছায়া থাকবে, যা আলোক-উজ্জ্বল থাকবে। ৩. পাখিদের দু’টি ঝাঁক হবে আর তারা তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে’।[৫]

সূরা কাহফের ফযীলত :

জুমআর দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াতকারীর জন্য দুই জুমআর মাঝে একটি আলো প্রজ্বলিত হয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াত করবে, তার জন্য আল্লাহ দুই জুমআর মাঝে একটি আলো প্রজ্বলিত করবেন’।[৬]

সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

আবু দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তি পাবে’।[৭]

সূরা সাজদাহ ও সূরা দাহরের ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমআর দিন ফজর ছালাতের প্রথম রাকআতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الٓمٓ تَنْزِيْلُ) السَّجْدَةِ وَ (هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ) وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমআর দিন ফজরের ছালাতে সূরা সাজদাহ এবং সূরা দাহর পড়তেন। আর জুমআর ছালাতে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফিকূন তেলাওয়াত করতেন।[৮]

সূরা জুমআর ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমআর ছালাতে সূরা জুমআ এবং সূরা মুনাফিকূন তেলাওয়াত করতেন। আগের হাদীছটিতে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা দেখে এসেছি।

সূরা আ‘লা ও গাশিয়ার ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই ঈদের ছালাতে এবং জুমআর ছালাতের প্রথম রাকআতে সূরা আ‘লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ তেলাওয়াত করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِـ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى) وَ (هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَاُ بِهِمَا اَيْضًا فِى الصَّلاَتَيْنِ.

নু‘মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় ঈদের ছালাত এবং জুমআর ছালাতে ‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা’ এবং ‘হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া’ তেলাওয়াত করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ঈদ এবং জুমআর ছালাত একই দিনে হতো, তখনো তিনি এই উভয় ছালাতে সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করতেন।[৯]

(ইনশা-আল্লাহ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৫।
৬. জামেউল আহাদীছ, হা/২৩৪৪০; বায়হাক্বী, হা/৩০৩৯।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৯।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৯।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮।

কুরআন, হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে মানবজিহ্বার রহস্য

-মো. হারুনুর রশীদ*

জিহ্বাকে আরবীতে ‘লিসান’ বলা হয়। এটি একটি গোশতপিণ্ড। জ্ঞানীরা জিহ্বাকে ‘হৃদয়ের দরজা’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের অন্তরের গোপনীয়তা জিহ্বা দ্বারাই প্রকাশ পায়। এর ক্ষমতা প্রবল ক্ষমতাশালী নরপতি হতেও বেশি। জিহ্বা হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের একটি। আল্লাহ তাআলা জিহ্বাকে বিভিন্ন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা ও মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ - وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ ‘আমি কি তার জন্য দুটি চোখ বানাইনি? আর একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট!’ *(আল-বালাদ, ৯০/৮-৯)*।

জিহ্বা বা মুখের ব্যবহার থেকেই বুঝে নেওয়া যায়, কোন ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান অথবা নির্বোধ? কে কতটা সভ্য অথবা অসভ্য? এই জিহ্বার অযাচিত ব্যবহারের ফলেই অনেককে হতে হয় বিপন্ন অথবা লাঞ্ছিত। এই জিহ্বার অপব্যবহারের কারণেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অনেক মানবসন্তানকে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ এই জিহ্বা। এটি একটি মাংসল অঙ্গ, যা মুখের ভেতর অবস্থিত। জিহ্বার গোড়াকে বলে শিকড়। এই শিকড় গলার ভেতরের অঙ্গের সাথে সংযুক্ত তথা হাইওয়েড নামক হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। চোয়ালের হাড়ের সঙ্গেও রয়েছে এ অঙ্গের সংযুক্তি।

জিহ্বার রহস্য ও আধুনিক বিজ্ঞান: রাসায়নিক দ্রব্য সম্ভারে গঠিত এই জিহ্বা। পাকস্থলীর প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ একে বলা চলে। দ্রব্য মুখে পুরার পরই আরম্ভ হয় এই জিহ্বার স্বাদ। এটা নরম, আঠালো এবং পিচ্ছিল সংকোচন ও প্রসারণবিশিষ্ট। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই ঘোরানো-ফিরানো যায়। এর রাসায়নিক ক্রিয়াই সবচেয়ে অদ্ভুত এবং রহস্য সৃষ্টিকারী। মনে হয় হাজার রকম ‘ফিল্টার’ এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিটি জিনিস জিহ্বায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষেই চোখ বুজলে বলা যায় এবং ভাগ করা যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমরা ল্যাবরেটরিতে এক পদার্থ হতে অন্য পদার্থকে পৃথক করে থাকি। সেখানে H2S, H2SO4, NH3NO4, NH4SO4, HCI, NH3 ইত্যাদি রাসায়নিক এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। জিহ্বাকে বিশ্লেষণ করে উক্ত সাহায্যকারী এজেন্টগুলো দেখতে পাই না; তবে এটা হতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয় যা খাদ্যকে নরম, পিচ্ছিল ও ভোজন উপযোগী করে পাকস্থলীতে পাঠায়। আর এই নিঃসৃত রস উক্ত রাসায়নিক এজেন্ট হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

জিহ্বাকে ডাক্তারি মতে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় কতকগুলো গোশত স্তর একটার উপর আরেকটা মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ জিহ্বার রূপ নিয়েছে। এর উপরি ভাগ ছিদ্র ছিদ্র। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এখানে খাবার উপযোগী পদার্থগুলোই এটা গ্রহণ করে আর বাকিগুলো অন্য কোনো অঙ্গের পরামর্শ না নিয়েই ফিরিয়ে দেয়। যেমন— পচা, দুর্গন্ধময়, বিষজাতীয় দ্রব্য, বিষাক্ত পদার্থ এতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেয় আর উপযোগী খাদ্য পেলে যতক্ষণ পর্যন্ত পাকস্থলী পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যপ্রণালি আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সম্ভব হয় না। জিহ্বাকে কেটে তুলে ফেলে আমাদের তৈরি নতুন জিহ্বা স্থাপন করা চলে না অথবা এর পরিবর্তে অন্য কোনো ‘ফিল্টার’ বসিয়েও কোনো খাদ্যদ্রব্যকে পৃথক করে দেখা যায় না। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জিহ্বা গঠিত, সেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়েও আমরা নতুন জিহ্বা তৈরি করতে পারি না অথবা এর অনুরূপ সৃষ্টি করে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই।

জিহ্বার ছাপের মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ: আমরা কি কখনো আমাদের জিহ্বা নিয়ে বিস্মিত হয়েছি? এটা আল্লাহ পাকের এক অতীব বিস্ময়কর সুন্দর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে একটাই জিহ্বা দান করেছেন। কিন্তু এই একটা মাত্র জিহ্বা দিয়ে আমরা হাজার রকম খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। যদি আমাদের জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকত, তাহলে আমরা একটা আম আর একটা মাটির দলার মধ্যে কোনো তফাত ধরতে পারতাম না।

আমরা জানি, আমাদের হাতের আঙুলের যে ছাপ তা একেক মানুষের একেক রকম। কারো ছাপের সাথে কারো ছাপের মিল নেই। হাতের আঙুলের মতো আমাদের জিহ্বার ছাপও কিন্তু একেক জনের একেক রকম। আল্লাহ তাআলা আমাদের শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী এই অঙ্গটি দান করেছেন তাঁর প্রশংসা গাওয়ার জন্য। সত্যিকারভাবে এই জিহ্বার সাহায্যেই আমরা মহিমাময় কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি। আল্লাহর বড়ত্ব, মাহাত্ম্য নিয়ে কথা বলতে পারি। আল্লাহ তাআলা মিথ্যা কথা বলা, গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা এসব খারাপ কাজে জিহ্বাকে দূষিত করার জন্য সৃষ্টি করেননি।

* ফরক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।

জিহ্বা ও আধুনিক বিজ্ঞান: জিহ্বা মানুষের মুখগহ্বরের সম্মুখভাগে বিদ্যমান, যাতে ক্ষতিকর জিনিস মাত্রকেই সে সঙ্গে সঙ্গে উগলে ফেলে দিতে পারে। কোনো জিনিস তিক্ত না মিষ্টি, ঠাণ্ডা না গরম, টক না লোনা, কোমল না কটু তা মানুষ এই যন্ত্রের দ্বারাই টের পায়। মানুষের জিহ্বায় রুচিবোধের জন্য ৯ হাজার সেল কোষ আছে, যার প্রতিটি সেল একাধিক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ প্রতিটি বস্তুর স্বাদ ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুভব করতে পারে। যেমন— আপেল, কমলা, আম প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ আমরা বুঝতে পারি। চিকেন, মাটন, বীফ প্রত্যেকটি মাংস জাতীয় খাদ্য; কিন্তু এদের আলাদা আলাদা স্বাদ পরখ করা যায়। জিহ্বার মধ্যে আস্বাদন স্তর না থাকলে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এক রকম মনে হতো। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, আমরা জিহ্বা দিয়ে যখন কথা বলি, তখন জিহ্বার **১ লক্ষ ১৭ হাজার** সেল একত্রে এসে এমনভাবে আমাদের কথাগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয়, যাতে কোনো কথার সাথে কোনো কথার সংঘাত না হয়। এখন প্রশ্ন হলো, কোন সে মহাকারিগর যিনি এই বিস্ময়কর পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? শুধু তাই নয়, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর দেহে তিনি সেলগুলো তৈরি করেননি।

জিহ্বার লালা ও আধুনিক বিজ্ঞান: মুখের ভেতর আল্লাহ তাআলা অতি প্রয়োজনীয় এক প্রকারের তরল লালা সৃষ্টি করেছেন, যা খাদ্যের সাথে মিশে হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। আহারের সময় এই লালা আবশ্যক পরিমাণে নির্গত হয় এবং খাবারের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এটি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও সুনিপুণ কৌশলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ যদি না হতো এবং সর্বদা এই লালা নির্গত হতে থাকত, তবে মুখ খোলাই সমস্যা হয়ে পড়ত। আর কথাবার্তা বলা তো আরও কঠিন হয়ে পড়ত। কারণ মুখ খুললেই বা কথা বলতে গেলেই লালা গড়িয়ে পড়ত এবং বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতো। মহান আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, এই লালা শুধু খাদ্য চিবানোর সময় নির্গত হয় এবং পরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে অন্য সবসময় মুখে লালা সীমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, যাতে মুখ ও কণ্ঠনালি সিক্ত থাকে। নতুবা কণ্ঠনালি শুকিয়ে যেত এবং কথা বলা অসম্ভব হয়ে পড়ত। এমনকি কণ্ঠনালি শুকিয়ে শ্বাসগ্রহণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ত। যার ফলে অনিবার্যভাবে প্রাণনাশ ঘটত।

জিহ্বার স্বাদ: জিহ্বা নাকের মতো একইভাবে কাজ করে। এটি তার পৃষ্ঠের পেপিলি নামক দোলগুলোতে অবস্থিত ক্ষুদ্র স্বাদের কুঁড়ি ব্যবহার করে খাবার এবং পানীয়গুলোতে ফ্লেভারেন্ট (Flavorants) নামক পদার্থ শনাক্ত করে। স্বাদ গ্রহণের স্বাদকুঁড়ি নাকের ঘ্রাণযুক্ত প্যাঁচগুলোর অনুরূপভাবে কাজ করে। তারা মস্তিষ্কের গস্টেটরি (Gustatory) সেন্টারে স্নায়ু সংকেত পাঠায়, যা আপনি কী স্বাদে স্বাদ গ্রহণ করছেন তা কার্যকর করে। আপনার স্বাদ এবং গন্ধের সংবেদনগুলো একসাথে কাজ করে ফ্লেভারটি নির্ধারণ করে।

জিহ্বার শক্ত স্বাদ: আপনি বিভিন্ন স্বাদ বুঝতে পারেন। এগুলোকে সাধারণত পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়— মিষ্টি, লবণাক্ত, টক, তেতো এবং মজাদার। তবে মরিচের মতো মশলাদার স্বাদসহ আরও কিছু থাকতে পারে। মরিচে এমন একটি রাসায়নিক উপাদান করে, যা জিহ্বাকে জ্বালায়।

জিহ্বার ভাষা তৈরির রহস্য: পৃথিবীতে মানুষের মতো করে আর কোনো প্রাণী নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে কথা বলা শিখিয়েছেন। কুরআন মাজীদে আছে, ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ-عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ‘তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে কথা বলতে শিখিয়েছেন (বাকশক্তি দান করেছেন)’ *(আর-রহমান, ৫৫/৩-৪)*।

পাকস্থলীর অঙ্গ হিসেবে কাজ করা ছাড়া জিহ্বার আরও একটা প্রধান এবং প্রয়োজনীয় কাজ আমরা দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু মনের ইচ্ছাকে এই শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে কথায় রূপান্তর করতে পারি না। যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করি, সেটাতে ভাব ও আবেগের প্রকাশ হয় না। বাংলা ভাষাতে নাই-বা হলো, আরবী, ইংরেজি, ফরাসি, ল্যাটিন প্রভৃতি সেরা ভাষাগুলোরও কোনো সৃষ্টি এতে দেখা যায় না। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি এই জিহ্বা গলার সুরকে নিয়ে ইচ্ছামতো মনের আবেগ ও ভাবকে প্রকাশ করে। তালুর সঙ্গে এক ধাক্কা দেয়, দাঁতের সঙ্গে এক ধাক্কা দেয়। আবার প্রয়োজনে এক ধাক্কা দিয়ে নাকের ভেতরও কিছু শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে সুন্দর, সুললিত ভাষায় বের করে। অদ্ভুত এর কারুকার্য, অদ্ভুত এর কার্যপ্রণালি। ইংরেজি, ফরাসি, উর্দূ, কোনো ভাষাতেই এর ব্যবধান নেই। যে কোনো ভাষায় ইচ্ছার প্রকাশ করার মতো ব্যবহার এই জিহ্বা জানে।

কোন সে কারিগর, যিনি জিহ্বাকে দিয়ে শব্দতরঙ্গে আলোড়ন এনে কথা সৃষ্টি করেন? কোন সে রসায়নবিদ, যিনি সর্বদা জিহ্বাকে আর্দ্র রাখেন, যার ফলে কথা নষ্ট হয় না? কোন সে আদেশদাতা, যার বদৌলতে তা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে উচ্চ ও নিম্ন স্বরে কথা সৃষ্টি করেন? তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্নিবেশিত করেছেন।

আমাদের স্বরযন্ত্রে যে কথা তৈরি হয়, তাতে জিহ্বা অংশগ্রহণ করে থাকে। জিহ্বা না থাকলে প্রয়োজনীয় কথা তৈরি করে তার ডেলিভারি দেওয়া মোটেও সম্ভব হতো না। আমাদের ঠোঁট দুটি কথা বলার সময় সঞ্চালিত হয়। খাদ্য ও পানীয় সর্বপ্রথম রিসিভ করে ঠোঁট। পরে মুখের ভেতর আবদ্ধ করে উপযোগিতা সৃষ্টি করে। মানুষের ঠোঁটদ্বয় দাঁতের উপর আবৃত্ত থাকে, যার দরুন চেহারার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

জিহ্বা সম্পর্কে অজানা কিছু তথ্য:

(১) জিহ্বা মানবদেহের সবচেয়ে নমনীয় মাংসপেশি।

(২) জিহ্বাই একমাত্র মাংসপেশি, যেটি মানবদেহের এক প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে।

(৩) জিহ্বায় আটটি মাংসপেশি আছে।

(৪) জিহ্বার উপরিপৃষ্ঠকে 'ডরসাম' বলা হয়।

(৫) আঙুলের ছাপের মতো প্রত্যেক মানুষের জিহ্বার ছাপও আলাদা আলাদা রকমের হয়।

(৬) নাক বন্ধ থাকলে অনেক সময় জিহ্বায় খাদ্যের স্বাদ অনুভব করা যায় না। মানুষ জিহ্বা দিয়ে প্রায় ৮০০০ রকমের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

(৭) ঝাল কোনো স্বাদ নয়। স্বাদ কোরকগুলো যখন ব্যথা পায় তখন সেটিকে মস্তিষ্ক ঝাল হিসেবে বিবেচনা করে।

(৮) জিহ্বা দিয়ে নিজ হাতের কনুই স্পর্শ করা সম্ভব নয়।

(৯) জিহ্বা দিয়ে নাকের ডগা স্পর্শ করা যায়, তবে সেটি খুব কঠিন কাজ।

(১০) জিহ্বার নড়াচড়ায় লালা নিঃসরণ বাড়ে।

(১১) মানুষের জিহ্বা থেকে প্রতিদিন ২ থেকে ৩ পাইট লালা নিঃসৃত হয়।

(১২) জিহ্বার লালা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং হজমে সাহায্য করে।

যত বিপদ ডেকে আনে জিহ্বা: জিহ্বা মানুষকে ধ্বংসের অতলে ডুবাতে পারে, আবার সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। অধিকাংশ পাপ ও পুণ্যের কাজ জিহ্বা দ্বারাই সংঘটিত হয়। সুতরাং জিহ্বাকে সংযত রাখাই আবশ্যক। গীবত, মিথ্যা, কুটনামি, পরনিন্দা, অশ্লীল কথা, গালমন্দ ইত্যাদি এই জিহ্বারই কাজ। তাই বলা হয়, যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিলানো অপেক্ষা জিহ্বাকে সংযত রাখা অধিক কঠিন কাজ। এ ব্যাপারে উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, নাজাতের উপায় কী? তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। তোমার ঘরকে প্রশস্ত করো। ঘরকে প্রশস্ত করার অর্থ মেহমানদারি করো। তোমার অপরাধের জন্য কান্নাকাটি করো'।[১]

এছাড়া সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার জন্য যে জিনিসগুলো ভয়ের কারণ বলে আপনি মনে করেন, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর কোনটি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, 'এটা (অর্থাৎ জিহ্বা)'।[২] এই হাদীছ হতে বুঝা যায়, জিহ্বা কত ভয়াবহ। তা নিয়ন্ত্রণ করা বা সংযত করা বড়ই কঠিন। এ ব্যাপারে আসলাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি নিজের জিহ্বা টানছিলেন। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক। ব্যাপার কী? তখন আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করেছে।[৩]

সুতরাং জিহ্বার অসংযত ব্যবহারের কারণেই আজ স্বামী-স্ত্রীতে, মানুষে-মানুষে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অশান্তি বিরাজ করছে। এজন্যই আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহ্বা বা বাকশক্তি)-এর এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (লজ্জাস্থান)-এর নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব'।[৪] এই হাদীছে দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু দ্বারা জিহ্বা, মুখ আর দুই পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু দ্বারা লজ্জাস্থানকে বুঝানো হয়েছে। মূলত এই দুই অঙ্গ দ্বারা অধিকাংশ কাবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়। আর যে ব্যক্তি কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় না, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশে কোনো বাধা থাকবে না। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মুসলিমদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বলেন, 'যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে, সেই সর্বোত্তম মুসলিম'।[৫]

মানুষের সাথে একজন মুসলিম কীভাবে কথা বলবে, সে বিষয়ে ইসলাম কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি প্রণয়ন করে দিয়েছে। সর্বাবস্থায় মুসলিমকে অটুট বিশ্বাস নিয়ে মনে রাখতে হবে যে, তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি যদি উত্তম কিছু

১. সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৯০।
২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৭২, হাদীছ ছহীহ।
৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৬২১।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৮৪।

বলেন, তিনি পুরস্কৃত হবেন আর যদি মন্দ কিছু বলেন, তবে সেই মন্দ কথার জন্য তাকে অবধারিতভাবেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার সাথেই রয়েছে’ *(ক্বাফ, ৫০/১৮)*। রাসূল ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মুখের কথা খুবই বিপজ্জনক। একটি হাদীছে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘বান্দা অনেক সময় এমন কথা বলে, যাতে সে গুরুত্ব দেয় না; অথচ সেই কথা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ফলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা অনেক সময় এমন কথাও বলে, যাতে সে গুরুত্ব দেয় না; অথচ সেই কথা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। ফলে সেই কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে’।[৬]

কাজেই মুখের কথা বিপদের কারণ হতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থেকে আমাদেরকে কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্যই রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; অন্যথা চুপ থাকে’।[৭] ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির বক্তব্য এ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে স্পষ্ট যে, কোনো কথায় উপকার ও কল্যাণ নিহিত না থাকলে তা না বলাই কর্তব্য। তবে যে কথা বললে উপকার ও কল্যাণ হয়, তা বলাই কর্তব্য। কিন্তু যদি কল্যাণের দিকটা সন্দেহপূর্ণ হয়, তবে কথা না বলাই উত্তম। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩৬)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে, যে বিষয় তোমার জানা নেই, তা কাজে পরিণত করো না। জানাশোনা ছাড়াই কাউকে দোষারোপ করো না। কারণ ক্বিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে। কানকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কী কী শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কী কী দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কী কী কল্পনা করেছ এবং কী কী বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীআতবিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে, যেমন কারো গীবত এবং হারাম গানবাদ্য শোনা কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীআতবিরোধী বস্তু দেখে থাকে কিংবা অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ মনে ক্বায়েম করে থাকে, তবে এসব প্রশ্নের ফলে ক্বিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে বলেন, ‘বান্দা যখন ভালোমন্দ বিচার না করে কোনো কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায়, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান’।[৮]

আমাদেরকে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এই আমানতের হেফাযত করতে হবে। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে তাঁর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। তাতেই হবে নেয়ামতের শুকরিয়া ও আমানতের হেফাযত। আমার এ চোখ দিয়ে আমি এমন কিছু দেখব না, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। হাত দিয়ে এমন কিছু ধরব না, যা ধরতে তিনি নিষেধ করেছেন। এমন পথে পা বাড়াব না, যে পথ শয়তানের। আমার যবান দিয়ে এমন কথা বলব না, যা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মোটকথা, আমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে ভালো কাজ করব, খারাপ থেকে বিরত থাকব। কারণ আমার এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাল সাক্ষী হবে। ভালো কাজ করলে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে আর মন্দ কাজ করলে আমারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। সে এক কঠিন পরিস্থিতি! বান্দা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। একমাত্র চেষ্টা হবে, কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে। বান্দা চেষ্টা করবে পাপ অস্বীকার করতে। এমন সময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাক্ষী দেওয়ার। আল্লাহ সেগুলোকে কথা বলার শক্তি দিবেন, সেগুলো কথা বলবে। আমাদেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদের সব গোপন বিষয় বলে দিবে, সব সত্য বলে দিবে। আমরা অস্বীকার করতে পারব না। আল্লাহ আমাদের যবানে মোহর মেরে দিবেন। আমরা কিছু বলতে পারব না, অস্বীকারও করতে পারব না; কথা বলবে শুধু আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেমন কুরআনে এসেছে, ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্মের’ *(ইয়াসীন, ৩৬/৬৫)*।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৪ নং পৃষ্ঠায়)

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৮।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৮।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৮।

পাশ্চাত্য চশমায় ইসলাম!

-মুস্তফা মনজুর*

বাংলাদেশে ইসলাম সম্পর্কিত টকশোগুলো দেখে আমার একটা কথাই শুধু মনে হয়— এসব বক্তা বা আলোচক ইসলামকে জানেনই না। যতটুকু জানেন, তা ইসলাম বুঝার জন্য কোনোক্রমেই যথেষ্ট নয়। আজ থেকে প্রায় ২০ বছর পূর্বে আরজ আলী মাতুব্বর পড়ার সময়ও একই কথা মনে হয়েছিল। অবস্থা এতটুকুও পাল্টায়নি।

যারা ইসলামের বিপক্ষে নানা প্রশ্ন তুলছেন, তাদের সিংহভাগকেই জ্ঞানী বলতে আমার বাঁধছে। কারণ জ্ঞানীর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— ভালোভাবে জেনে-বুঝে কিছু বলা। সেটা কোনো মতবাদ সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমনই সত্য কোনো বই বা শাস্ত্র সম্পর্কেও। হ্যাঁ, যদি কিছুটা পড়াশুনা করে কিছু বলা হয়, তবে সেক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে— যখন মূল সত্য ও ব্যাখ্যা কোনো জ্ঞানীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে, তখন তা মেনে নেওয়া। এটাই জ্ঞানীর লক্ষণ।

অথচ আমাদের এসব পণ্ডিতদের অবস্থা উল্টো। ক্ষমতা আর মিডিয়ার জোরে তারা যা বলছেন, তা-ই সঠিক। অন্যরাই বরং পড়াশুনা করে ভুল বুঝছে— এটাই তাদের মূলমন্ত্র। এটা মূলত পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত কিছুই নয়। আমি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গবেষণা খারাপ সেটা বলছি না। বরং তাদের গবেষণার মাপকাঠিতেও আমরা এখন পর্যন্ত কিছুই না। আমি বলছি ইসলাম নিয়ে তাদের ধারণা প্রসঙ্গে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা মোটাদাগে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

প্রথমত, তারা ইসলামকে অধ্যয়ন করেন শাস্ত্র হিসেবে। যেমন করেন অর্থনীতি, রাজনীতি, পদার্থ, রসায়ন। পাশাপাশি ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে ইসলামকে অন্য ধর্মের মতোই মনে করেন। ফলে ইসলামের যে প্রায়োগিক দিক আছে, তা তারা অলমোস্ট ভুলেই যান। প্রায়োগিক দিকের যে ইসলামকে তাঁরা দেখেন তা হচ্ছে, পাশ্চাত্য মিডিয়ার প্রচারিত তথাকথিত মৌলবাদী ইসলাম।

বাংলাদেশের অবস্থাও তেমন। এখানে যারা ইসলামের সমালোচনা করছেন, তাদের কাছেও ইসলাম একটা ধর্ম মাত্র; যেমন হিন্দু, খ্রিষ্টান ও ইয়াহূদী ধর্ম। অথচ এর বাস্তবতা যে নিতান্তই আলাদা তা তাদের জ্ঞানে আসে না বা আসতে দেন না।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামের মূল্যায়ন হয় বস্তুবাদিতার মাপকাঠিতে। পার্থিব লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করেন। যেমন রিদ্দার যুদ্ধের কারণ হিসেবে যেখানে আমরা মুসলিমরা দ্বীন ত্যাগের কথাই বেশি অনুভব করি, সেখানে তাঁরা এটাকে একেবারেই গৌণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণই তাদের কাছে মুখ্য। কারণ তাদের হিসেবে পার্থিব কোনো স্বার্থ না থাকলে কীভাবে এসব করা হয়।

এজন্যই ছাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগ, অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাদের অধ্যয়নের মূল বিষয় নয়। কারণ এগুলো বস্তুবাদিতার মূলে কুঠারাঘাত হানে। অথচ ছাহাবা, তাবেঈন ও সালাফ ছালেহীনের আখেরাতমুখী জীবনযাপন ইসলামের মূল চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদেরও একই রোগ। তাদের কাছেও সবই লাভ-লোকসানের নিক্তিতে পরিমাপযোগ্য। অথচ ইসলাম দুনিয়াবিমুখতা ইত্যাদির শিক্ষাই বেশি দিয়ে থাকে। ফলে ইসলামের মূল চেতনা তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। দ্বীনের জন্য একজন মানুষ কীভাবে জানমাল পরিত্যাগ করে, নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে উল্টো কথা বলে তা তাদের বুঝে বা ব্যাখ্যায় আসে না।

বস্তুবাদিতার ফলেই তারা খেলাফাতের উদাহরণ খুঁজেন। ইসলাম প্রসঙ্গে মুসলিমদের যে-কোনো কথাকেই তারা রাজনৈতিক ফ্লেভার দিয়ে দেন। অথচ ক্ষমতা দখল নয়, নেতৃত্ব নয়; ইসলামের মূল চেতনা হচ্ছে সবাই মুসলিম হয়ে যাওয়া, আল্লাহর অনুগত হয়ে যাওয়া। তা ক্ষমতা যার হাতেই থাকুক সে যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে কোনো মুসলিমেরই আপত্তি থাকে না। বস্তুবাদিতা ইসলামের এ চেতনা ধারণ করতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ।

তৃতীয়ত, ইসলামকে খণ্ডিত আকারে দেখা। অথচ ইসলাম সার্বিক জীবনব্যবস্থা। পাশ্চাত্য রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সব কিছুকে আলাদা করে নিয়ে অধ্যয়ন করছে।

সুধী পাঠক! এটা গাড়ি নয় যে ইঞ্জিন নষ্ট হলে তা খুলে নিয়ে ঠিক করে নিলাম; বাকী পার্টগুলো আর ঠিক করতে হবে না। ইসলামে সবকিছু একটার সাথে অন্যটা জড়িত। একটা নষ্ট হলে অন্যটাও নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই একটি কাজের সাথে অন্যগুলোও জড়িত থাকে। ইসলামের এই সার্বিক রূপরেখাও তাদের ধারণার বাইরে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আরও অনেক কিছুই বলা যাবে। কিন্তু মোটাদাগে এসবই পাশ্চাত্যের ইসলাম অধ্যয়ন (থিওলজিক্যাল বিষয় বাদ দিয়ে)। এর প্রমাণ হিসেবে, ইসলামের অধ্যয়নে তাদের ফোকাসড বিষয়গুলো দেখেন। ইসলামকে জানার জন্য, বুঝার জন্য, অনুভব করার জন্য যেখানে ছাহাবীগণের, তাবেঈনের, সালাফদের আখলাক, চরিত্র, ধর্মভীরুতা, মানবিকতা, মানহাজ ইত্যাদি বেশি অধ্যয়ন করা দরকার, তারা এর ধারেকাছেও নেই। যেসব বিষয় বস্তুবাদিতার সাথে সম্পর্কিত (যেমন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আইন ইত্যাদি) সেসবই তাদের পাঠ্য। ফলে আমাদের আর তাদের মধ্যে ইসলাম জানার পার্থক্য রয়েই যাবে, তা বুঝা এমন আর কি কঠিন বিষয়।

আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও পাশ্চাত্যের আলোকেই ইসলাম ও মুসলিমকে বিচার করেন। এমনকি অনেকে শুধু উপরিউক্ত একটি বা দুইটি ধারণা নিয়েই ইসলামকে মূল্যায়ন করতে লেগে যান। তাতে খুব একটা অসুবিধা নেই, কিন্তু সমস্যা হয়ে যায়, যখন তারা ইসলামের মূল ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলেও মেনে নিতে অস্বীকার করেন। শুধু আলিফ-বা-তা পড়ে যদি নিজেদের ইসলামী পণ্ডিত ভাবেন, তাহলে তাদের নিকট থেকে ভালো কিছু আশা করাই বোকামি।

যেমনভাবে রঙিন চশমা পরা কারো নিকট থেকে বাস্তব দৃশ্যের সঠিক বর্ণনা আশা করা বৃথা। তা সে যত ভালো সাহিত্যিকই হোন। কেননা বাস্তবতাই তিনি দেখতে পান না। আর যিনি বিনা চশমায় প্রকৃতি দেখেন, তার বর্ণনাশৈলী যতই খারাপ হোক, তা নিশ্চিতরূপেই চশমাধারীর চাইতে সত্যের বেশি কাছাকাছি হবে।

হ্যাঁ, যদি সত্যিই কেউ ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করতে চান, তাহলে ডুব দেন ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলিতে। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সত্য অনুসন্ধান করলে আপনার সামনে ইসলাম তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য নিয়েই হাজির হবে। যুগে যুগে এমনটা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। শুধু দরকার চশমাটা খুলে ফেলে দেওয়া। তারপর দেখেন পৃথিবীর বাস্তবতা। সত্য তখন নিজেই আপনাকে তার কাছে টেনে নেবে।

“কুরআন, হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে মানবজিহ্বার রহস্য” এর বাকী অংশ

শুধু কী তাই! আমার শরীরের চামড়াও সাক্ষ্য দিবে আমার বিরুদ্ধে, যদি আমি তা আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহার করি। যে চামড়া আমার চেহারাকে সুন্দর করেছে, তা যদি আমি আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহার করি, হারাম ক্ষেত্রে রূপের প্রদর্শন করি, তাহলে তা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। সে বলবে, দুনিয়াতে তুমি আমাকে আমার রবের নাফরমানীতে ব্যবহার করেছ। সেদিন আমি কিছু বলতে পারিনি। আজ আমার রব আমাকে বলার শক্তি দিয়েছেন। আমি আজ সব বলে দিব। তখন মানুষ নিজের শরীরের চামড়াকে বলবে, ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?’ সেগুলো উত্তর দিবে, ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ‘ঐ আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে’ *(হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪১/২১)*।

হ্যাঁ, এখনই আমাকে ভাবতে হবে আমার অবস্থা কেমন হবে। আল্লাহর দেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আমি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করছি, না তাঁর নাফরমানীতে? তা কি ক্বিয়ামতের ঐ কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর সামনে, সকল সৃষ্টিজীবের সামনে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, না বিপক্ষে?

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা-সরল থাকো, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন করো, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব’ *(তিরমিযী, হা/২৪০৭, হাসান; আহমদ, হা/১১৪৯৮)*।

মূলকথা হলো, কথাবার্তা বলতে যবানের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ একটা অসত্য কথার কারণে, মুখের একটা খারাপ কথা উচ্চারণের কারণে স্বামী-স্ত্রীতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে হতাশা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর একটি সত্য ও ভালো কথার কারণে স্বামী-স্ত্রীতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি বিরাজ করে।

আল্লাহ আমাদেরকে জিহ্বার গুরুত্ব বুঝার এবং এর নেয়মতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায় নয়

-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে ব্যক্তির অন্তর আছে, অন্তঃকরণ নেই অথবা ভালোমন্দ বুঝার সক্ষমতা নেই, সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। তেমনিভাবে যে দেশে এমন একটি জাতি আছে, যাদের শিক্ষা নেই, সে দেশ কখনো উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। একটি জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয়। এজন্য রাসূল ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মদীনাবাসীর শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি মদীনার শিশুদের পড়ালেখা শেখানোকে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারণ করেন।

তবে হ্যাঁ, সে শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে সুশিক্ষা। যা মানুষকে প্রকৃত অর্থেই মানুষ বানায়, ভিতর থেকে দূর করে পশুত্ব; শিক্ষা দেয় আল্লাহর পরিচয়, রাসূল ﷺ-এর পরিচয়। যা ইসলাম, আদব-শিষ্টাচার, হারামকে হারাম এবং হালালকে হালাল হিসেবে চেনার পথ বাতলে দেয়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে বিশেষ করে যারা সারাক্ষণ নারীর স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে পরিবেশ গরম রাখে, তারা মনে করে ও দাবি করে, ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায়, ইসলাম তাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ঘরবন্দি করে রেখেছে এবং তাদের শিক্ষার অধিকার হরণ করেছে (!)। তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। কেননা ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ‘বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?’ *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ‘বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন’ *(ত্বা-হা, ২০/১১৪)*।

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যাতে ‘আমভাবে (অর্থাৎ কাউকে নির্ধারণ না করে) জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। এছাড়া বহু হাদীছ আছে, যা নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে। সেখান থেকে কয়েকটি উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি। যেমন—

রাসূল ﷺ নারীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দিন নির্ধারণ করেছিলেন এবং সে নির্ধারিত দিনে তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) নারীগণ নবী ﷺ-কে বললেন, পুরুষেরা আপনার নিকট থেকে আমাদের চেয়ে বেশি উপকার গ্রহণ করছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন, সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাদের নছীহত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন’।[১]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হক্ব কথা বলতে আল্লাহ তাআলা লজ্জাবোধ করেন না। অতএব, কোনো নারীর পুরুষদের মতো স্বপ্নদোষ হলে তাতে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, যখন সে পানির (বীর্যপাতের) চিহ্ন দেখতে পায়, তখন যেন গোসল করে নেয়’।[২]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুবায়শের কন্যা ফাতেমা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, হে

১. ছহীহ বুখারী, হা/১০১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৯১, ৬১২১; তিরমিযী, হা/১২২; ছহীহ মুসলিম, হা/৩১৩; নাসাঈ, হা/১৯৭; ইবনু মাজাহ, হা/৬০০।

* কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

www.al-itisam.com

আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি (একজন ইসতিহাযার রোগী), আমি পবিত্র হই না। তাহলে আমি ছালাত ছেড়ে দিব কি? তিনি বললেন, ‘না, এটা শিরার রক্ত; হায়েয নয়। যখন হায়েয শুরু হবে, ছালাত ছেড়ে দিবে। যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে, তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোসল করে নেবে) এবং ছালাত আদায় করবে’।[৩]

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম নারীশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে, গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমনকি এটাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) বলেছে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয’।[৪]

ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, اَلْمَرْأَةُ شَخْصٌ مُكَلَّفٌ كَالرَّجُلِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا طَلَبُ عِلْمِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهَا لِتَكُوْنَ مِنْ أَدَائِهَا عَلَى يَقِيْنٍ অর্থাৎ ‘পুরুষের ন্যায় নারীর ওপর শারঈ বিধান প্রযোজ্য। তাই নারীর ওপর যেসব বিষয় ওয়াজিব, সেসব বিষয়ের জ্ঞানার্জন করাও তাদের ওপর ওয়াজিব। যাতে সে শারঈ বিধানাবলি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আদায় করতে পারে’।[৫]

শুধু তাই নয়, বরং ইসলাম কিছু শর্তসাপেক্ষে ও আদব রক্ষা করে বাড়ির বাইরেও শিক্ষার্জনের অভিপ্রায়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। যেমনটি উপরিউক্ত হাদীছগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তবে হ্যাঁ, ইসলাম নারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য গাইডলাইন হিসেবে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যেমনভাবে পুরুষের ক্ষেত্রেও আরোপ করেছে। কেননা ইসলাম শান্তির ধর্ম; তা কখনো নগ্নতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার অনুমতি দেয় না। তাই এখানে নারীদের জ্ঞানার্জনের কতিপয় শর্ত ও আদব উল্লেখ করা হলো-

(১) ছেলে ও মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ থাকা। ছেলে-মেয়ে একাকার না হয়ে হয়ে যাওয়া। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ‘সাবধান! কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান অবস্থান করে (এবং পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)’।[৬]

(২) মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ থাকা।

(৩) সফরের দূরত্বে পড়াশুনা করতে গেলে সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা। রাসূলুল্লাহ বলেন, وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‘কোনো মহিলা যেন তার মাহরাম ব্যতীত একাকী সফরে না যায়’।[৭]

(৪) চক্ষু অবনত রাখা। পর্দা ও শারঈ বেশভূষা ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ ‘আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে, তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে আর তাদের শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

(৫) সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ ‘আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*।

(৬) সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার না করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘নারীরা যখন সুগন্ধি লাগিয়ে জনসমাজকে এর গন্ধ বিলানোর জন্য তাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সে তখন এরূপ এরূপ’। একথা বলে তিনি একটি কঠোর মন্তব্য করেন।[৮]

শেষ কথা হলো, বিশ্বাস করো বোন! যারা সারাক্ষণ নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারা আসলে তোমাদেরকে মাঝপথে বেপর্দা করে ছাড়বে। তারা যেমন পরপুরুষের সাথে গায়ে গা লাগিয়ে চলছে, তোমাদেরকেও তাদের মতো লজ্জাহীন করে ছাড়বে। তাই এখনই সাবধান হও! তাদের কথায় কান দিয়ো না। তাদের সাজানো-গোছানো মিষ্টি কথায় প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকটা বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩০৬।
৪. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।
৫. ইমাম ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা, পৃ. ৭।
৬. তিরমিযী, হা/২১৬৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৩১১৮।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪১।
৮. আবূ দাঊদ, হা/৪১৭৩, হাসান।

আরকানুল ইসলাম ও পাঁচটি জরুরী বিষয় সংরক্ষণের গুরুত্ব

[৯ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১৫ জুন, ২০২৪। আরাফার মাঠে অবস্থিত 'মসজিদে নামিরা'য় আরাফার খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. মাহের বিন হামাদ আল-মুআয়কিলী*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি প্রজ্ঞাময় ও সকল বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। 'তিনি দিনকে রাতের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৪)*। 'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত করো। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক' *(আল-আনআম, ৬/১০২)*। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ এবং তাদের অবস্থার সংশোধনের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। 'এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৯)*।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত সত্যিকারার্থে কারো ইবাদত করা সমীচীন নয়। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানানোর জন্য, যার কারণে তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমার রহমত সব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত আর তা আমি তাদের জন্য লিখে দিব যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, যাকাত দিবে আর যারা আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাসী হবে। যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তাঁর প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে। বলো, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আন। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৫৬-১৫৮)*। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবীগণ ও সকল অনুসারীদের প্রতি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! 'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোনো উপকারে আসবে না তার পিতার। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে' *(লুক্বমান, ৩১/৩৩)*। কেননা যে ব্যক্তি তাক্বওয়ার অধিকারী হয় সে দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম পরিণাম ও নিশ্চিত বিজয় লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মুত্তাক্বীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না' *(আয-যুমার, ৩৯/৬১)*। 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই' *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*। 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন' *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*। 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে মহান করে দেন' *(আত-তালাক, ৬৫/৫)*।

আর আল্লাহভীতির অপরিহার্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে, বান্দা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, অন্য কারো ইবাদত করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না' *(ইউসুফ, ১২/৪০)*।

হে মানুষ সকল! 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (পরহেযগার) হতে পার' *(আল-বাক্বারা, ২/২১)*।

আর এটাই হলো তাওহীদের সাক্ষ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই'-এই কথার মর্মার্থ। যা দ্বীন ইসলামের নিদর্শন ও সাফল্যের চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৩)*। 'তিনিই তোমাদেরকে মায়ের পেটে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দেন, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহাশক্তিমান ও প্রজ্ঞাশীল' *(আলে ইমরান, ৩/৬)*।

তাওহীদের সাক্ষ্যের সাথে রিসালাতের সাক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪০)*।

এই দুটি বিষয়ের সাক্ষ্য ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে প্রথম রুকন। ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ক্বায়েম করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতি যে কিতাব অহী করা হয়েছে, তা থেকে তেলাওয়াত করো এবং ছালাত ক্বায়েম করো। নিশ্চয় ছালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

ইসলামের আরেকটি রুকন হলো, যাকাত আদায় করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে নবী!) তুমি তাদের ধনসম্পদ হতে ছাদাক্বা গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করে দিবে আর তাদের জন্য দু'আ করো। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন' *(আত-তওবা, ৯/১০৩)*।

ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে রয়েছে, রামাযান মাসে ছিয়াম রাখা। আল্লাহ বলেন, 'রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে ছিয়াম পালন করে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

ইসলামের আরেকটি রুকন হলো, সামর্থ্য থাকলে পবিত্র বায়তুল্লাহতে হজ্জ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে। যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে' *(আল-হজ্জ, ২২/২৭)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ইসলাম হচ্ছে— তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (মা'বূদ) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, ছালাত ক্বায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে তাহলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে'। তিনি আরো বললেন, 'ঈমান হলো এই যে তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, তার কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত নবীগণ ও শেষদিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাক্বদীর ও এর ভালোমন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে'। তিনি আরো বললেন, 'ইহসান হলো এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাকে দেখছ, যদি তাকে না দেখ, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে'।

হে মুমিনগণ! এই হলো আল্লাহর দ্বীন ও শরীআহ, যা তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে রহমতের চাদরে ঢেকে দিয়েছেন। ফলে এটি তাদের জন্য নানাবিধ কল্যাণ, উপকার বয়ে নিয়ে এসেছে এবং বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনিষ্টকর বিষয় প্রতিরোধ করেছে।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮; আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯৫।

এজন্যই আরাফার দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম' *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। আর নবী ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)*।

এই পরিষ্কার অবস্থান থেকে বরকতময় ইসলামী শরীআহ কল্যাণ অর্জন ও তা বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূরীকরণ ও তা হ্রাসকরণের মূলনীতি প্রবর্তন করেছে। পাশাপাশি এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, অকল্যাণ প্রতিহত করা কল্যাণ নিয়ে আসার চেয়েও অগ্রগামী। একইভাবে ছোট কল্যাণ ছেড়ে দিয়ে হলেও বড় কল্যাণ অর্জন করা এবং বড় ক্ষতি রোধ করার নিমিত্তে ছোট ক্ষতি মেনে নেওয়ার মূলনীতি নিয়ে এসেছে ইসলাম। একসাথে একাধিক বিষয়ের সম্মুখীন হলে সবচেয়ে বড় কল্যাণ ও সবচেয়ে ছোট ক্ষতিটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এভাবে ইসলামী শরীআহ গুরুত্বারোপ করেছে যে, একটি ক্ষতি দূর করতে গিয়ে আরেকটি ক্ষতি করা যাবে না। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও করা যাবে না।

সুতরাং যথাসম্ভব ক্ষতি রোধ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ইসলামী শরীআহ এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছে যা জীবনকে সমৃদ্ধ করবে এবং যার দ্বারা জীবনের উন্নতি ঘটবে। আমাদের শরীআহ অন্যের ক্ষতি করা থেকে অথবা কারো প্রতি কষ্ট পৌঁছানো থেকে নিষেধ করেছে। পাশাপাশি আদেশ দিয়েছে ন্যায়-নীতি, উত্তম চরিত্র, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, সত্য কথা বলা এবং অধিকার সংরক্ষণের সাথে সাথে হক্বদারের নিকট আমনত পৌঁছে দেওয়া, আমানত আদায় করা, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং শাসকের কথা শুনা ও তাদের আনুগত্য করা ইত্যাদি বিষয়ের। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন' *(আন-নাহল, ১৬/৯০-৯১)*। 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হক্বদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আন-নিসা, ৪/৫৮)*।

মহাপ্রজ্ঞাবান বিধানদাতা রব্বুল আলামীন পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। সকল শরীআতেই এ বিষয়গুলোকে সংরক্ষণের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তা হলো— ১. দ্বীন পালন করা, ২. জীবন রক্ষা করা, ৩. বিবেক-বুদ্ধিকে হেফাযত করা, ৪. সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং ৫. সম্মানের অধিকার সংরক্ষণ করা। বরং ইসলামী শরীআহ এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আর এজন্যই এ বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়াকে জান্নাতে প্রবেশ ও দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমসমূহের মাঝে বিশেষভাবে গণ্য করা হয় এবং সুখ-শান্তি, উন্নতি ও দুনিয়াতে সভ্যতার উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই গুণ অনুপস্থিত থাকলে জীবন বিঘ্নিত হয় এবং এতে ত্রুটি করলে তা আখেরাতে শাস্তির কারণ হবে। এই কারণেই বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) যেমন তা হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে'।[৩]

সুতরাং দ্বীন ইসলামের অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদত ছাড়া মানুষের অন্য কোনো উপায় নেই। আর কেবল এ লক্ষ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'বলুন, আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। আর তোমরা প্রত্যেক সিজদা বা ইবাদতে তোমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহকেই নির্ধারণ করো এবং তাঁরই আনুগত্যে

২. ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৫০।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে' *(আল-আ'রাফ, ৭/২৯)*।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং পরিহার করো তাগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ করো অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে' *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*।

মহান আল্লাহ মানুষের প্রাণ রক্ষাকে অপরিহার্য করেছেন এবং রক্তপাতের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকে নিষিদ্ধ করে এরশাদ করেছেন, 'আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন' *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। আর যে ঐ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। আর সেটি হবে আল্লাহর উপর সহজ' *(আন-নিসা, ৪/২৯-৩০)*।

একইভাবে আল্লাহ তাআলা সম্পদ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*।

আল্লাহ বিবেক-বুদ্ধির হেফাযতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?' *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)*।

আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে মানুষের সম্মানে আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তাদের কোনো অপরাধ ছাড়াই, তারা অপবাদের ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব' *(আন-নূর, ২৪/২৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! কোনো মুমিন সম্প্রদায় যেন অপর কোনো মুমিন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীরা যেন অন্য নারীদেরকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি নিকৃষ্ট। আর যারা তওবা করে না তারাই তো যালেম। হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১১-১২)*।

সুতরাং একজন মুমিনের জন্য উল্লেখিত অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি বিষয়ের হেফাযত করা জরুরী। এর মাধ্যমে তার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও জীবনের স্থিতি রক্ষিত হবে। সাধারণ মানুষ এর মাধ্যমে তাদের দ্বীন ও দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিল করতে সক্ষম হবে। আর এ লক্ষ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন নেকী অর্জনের জন্য মানুষের একে অপরকে সহযোগিতা করা কর্তব্য।

সম্মানিত হাজীগণ! আপনারা নিজেদের জন্য, নিজেদের পিতামাতা এবং যাদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সকলের জন্য দু'আ করুন। কারণ কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ 'আমীন' বলেন। আপনারা আমাদের ফিলিস্তীনী ভাইদের জন্য দু'আ করুন। তারা আজ ভীষণ দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত, শত্রুদের আঘাতে তাদের রক্ত ঝরছে, তাদের ঘরবাড়ি ও ভূ-খণ্ড শত্রুদের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হচ্ছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্য, খাবার, পানীয় ও বস্ত্র থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

কনগ্রাচুলেশন্স

*-রাকিব আলী**

[১]

আজকাল আমাদের কোনো বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিচিত কারো সফলতার কথা শুনলেই আমরা তাকে Congratulations জানানোর জন্য উঠেপড়ে লাগি। সোস্যাল মিডিয়ায় তো রীতিমতো Congratulations জানানোর এক ধুম পড়ে যায়। পক্ষান্তরে, অনেকে আবার অভিনন্দনটুকুই জানান না। বরং অন্যের সফলতা দেখে তাদের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেন তাদের ভেতর জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, তাদের যেন সহ্যই হচ্ছে না। ফলে তাদের মধ্যে কেমন জানি এক অশান্তির সৃষ্টি হয়। যার নেপথ্যে রয়েছে হিংসা আর হিংসা। এই হিংসাই মানুষকে পিছনের দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে।

কারো সফলতায় Congratulations জানানো মন্দ কিছু নয়। এটা বলা যেতেই পারে। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের এমন কিছু অবলম্বন করা দরকার, যা তার চেয়েও অনেক বেশি উত্তম। এই Congratulations জানানো মানুষের ভিড় থেকে আমরা নিজেদেরকে আলাদা করে রাখতে পারি। এমন এক কাজ করতে পারি, যা আল্লাহর কাছেও অনেক প্রিয় করে তুলবে।

আমরা চাইলেই কারো সফলতাতে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে এমন এক স্পেশাল উপায়ে অভিনন্দন জানাতে পারি, যা ঐ ব্যক্তি কোনোভাবে জানতে পারলে বিষয়টি তাকে রীতিমতো অবাক করে দিবে! এমনকি আবেগ-আপ্লুত পর্যন্তও করে দিতে পারে! সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহ তাআলা যদি ঐ ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের মাঠে দেখান যে, হে অমুক! দুনিয়ার জীবনে যেখানে তুমি বাছবিচারহীনভাবে অমুক-তমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলে, যাকে-তাকে বেস্ট ফ্রেন্ড মনে করেছিলে, সেখানে এই দেখো তোমার প্রকৃত বন্ধু কে ছিল, কে ছিল তোমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী! সেই মুহূর্তে প্রকাশ্যে Congratulations জানানো মানুষদের কারো নাম না এসে যখন আপনার নাম চলে আসবে, তখন সে দৃশ্য দেখে আপনার বন্ধু কী পরিমাণ খুশি হবে কিংবা আপনার নিজের মধ্যে কতোটা উৎফুল্লতা কাজ করবে, সেটা কি আপনি এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন?

আপনার কোনো বন্ধুর কোনো সফলতাতে যখন তার অন্যান্য বন্ধুরা তাকে Congratulations জানাতে তার ইনবক্সে কিংবা কমেন্ট বক্সে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, ঠিক তখন আপনি তাদের মতো উইশ না করে আপনি আপনার বন্ধুর জন্য যে কাজ করতে পারেন তা হচ্ছে, আপনি গোপনে আল্লাহর দরবারে তার জন্য এভাবে দু'আ করতে পারেন, হে আমার রব! আপনি আমার এই বন্ধুকে আরও ভালো অবস্থায় এবং ভালো অবস্থানে রাখুন। তাকে এমন অবস্থায় রাখুন, যে অবস্থায় থাকলে আপনি রব, তার উপর সবসময় সন্তুষ্ট থাকবেন।

হে আমার প্রতিপালক! আমি চাই না, আমি ভালো অবস্থানে থাকি আর আমার বন্ধু খারাপ অবস্থানে থাকুক। কারণ নিজে ভালো অবস্থায় থেকে আমার বন্ধুর খারাপ অবস্থা দেখে যেতে আমি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারব না মা'বূদ! এভাবে আপনি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে তার জন্য অন্তর থেকে দু'আ করতে পারেন।

জানেন, গোপনে কারো জন্য একদম মন থেকে কল্যাণ কামনা করা অর্থাৎ দু'আ করাতে এক অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি রয়েছে, তা অন্তত একবার না করে দেখলে বুঝবেন না। সফল হওয়া ব্যক্তিটি কিংবা যার জন্য আপনি দু'আ করছেন, সে ব্যক্তি আপনাকে যতই এড়িয়ে চলুক না কেন, আপনি কিন্তু তার জন্য দু'আ করেই যাবেন এমন মানসিকতা রাখবেন। বিশ্বাস করুন, তাতে আপনার মনের মধ্যে সত্যিই অন্য রকম এক ভালো লাগা কাজ করবে, অন্য রকম এক শান্তি অনুভূত হবে।

সত্যি কথা বলতে কি! কারো সামনাসামনি মঙ্গল কামনা করাকে প্রকৃত অর্থে মঙ্গল কামনা করা বলে না। কেননা প্রকাশ্য কারো মঙ্গল কামনা করাতে বিশেষ কোনো স্বার্থও থাকতে পারে। ফলে এমন কামনার বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু কারো জন্য গোপনে মঙ্গল কামনা করাতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার প্রিয় বান্দা হয়ে

* আম্বরখানা, সিলেট।

ওঠার স্বার্থ ব্যতীত আর কোনো স্বার্থ থাকার সুযোগ নেই। ফলে এর বিশুদ্ধতা নিয়েও আর কোনো প্রশ্নের ফাঁক থাকে না।

মূলত, সেটাকেই প্রকৃত মঙ্গল কামনা বলে, যেখানে গোপনে কারো জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়। আজকের যুগে যেখানে মানুষের হিংসা-অহংকার এর মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে একজন আরেকজনের ভালোটুকু সহ্য করতে পারে না, সেখানে কারো প্রতি গোপনে কল্যাণ কামনা করতে পারাটা আসলেই অনেক বড় এক আল্লাহওয়ালার পরিচয়। আল্লাহ তার এমন বান্দাদের জন্যেই তো অকল্পনীয় নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

[২]

একজন মানুষের জন্য আপনার সবচেয়ে বড় উপহার কী জানেন? গোপনে মন খুলে দু'আ করতে পারাই হচ্ছে কারো জন্য আপনার সবচেয়ে বড় উপহার। এর চেয়ে দাবী উপহার আর কিছুই হতে পারে না। এটি এমনই এক উপহার, যার কোনো মূল্য হয় না। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হবে'।[১]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, আপনি যদি আল্লাহর কাছে বলেন যে, হে আমার রব! আমার অমুক ভাইকে বা বোনকে ভালো ফলাফল করিয়ে দিন, তার হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিন, তার বিয়ে সহজ করে দিন, তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠ হয় এমনই এক উত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দিন, তবে এই দু'আ শুনে ফেরেশতাগণ কী করবেন জানেন? তারাও আপনার প্রতি খুশি হয়ে আপনার জন্য বলবেন, হে আমাদের রব! আপনার এই দু'আকারী বান্দার জন্য একই বিষয় কবুল করে নিন। অর্থাৎ আপনি তাকেও ভালো ফলাফল করিয়ে দিন, হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিন, তার বিয়ে সহজ করে দিন, তার জন্যও দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠ হয় এমনই এক উত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দিন।

১. সুনান আবূ দাঊদ, হা/১৫৩৪, ছহীহ।

এবার বুঝতেই তো পারছেন, কারো জন্য মঙ্গল কামনা করা মানে আল্টিমেটলি নিজের জন্যই মঙ্গল কামনা করা। আপনি যার জন্য যেমন দু'আ করছেন, সেই একই দু'আ কিন্তু আপনার নিজের জন্যও করা হয়ে যাচ্ছে। তাও আবার যেনতেন কেউ দু'আ করে দিচ্ছেন না, স্বয়ং আল্লাহর নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ আপনার জন্য দু'আ করে দিচ্ছেন। আর তা কতই-না সৌভাগ্যের বিষয়! সুবহানাল্লাহ! এমন বিষয় ভাবতেই তো কত ভালো লাগে! ইসলামের সৌন্দর্য আরও উপলব্ধি হয়।

অধিকন্তু, বিষয়টি অনেকটা এরকমও দাঁড়ায় যে, আপনি যদি অন্যের জন্য গোপনে দু'আ করার মাধ্যমে অন্যকে congratulate করেন, তাহলে ফেরেশতারাও আপনার জন্য দু'আ করার মাধ্যমে আপনাকে Congratulations জানানোর অপেক্ষায় আছেন। এখন আপনিই বলুন, আপনি কি ফেরেশতাদের congratulations পেতে চাইবেন না? নিশ্চয়ই আপনি তা পেতে চাইবেন। তাহলে অন্তরকে হিংসামুক্ত করে অন্যের জন্য মন থেকে দু'আ করতে কীসের এত কার্পণ্য? ফেরেশতাদের congratulations পাওয়ার জন্য নিজেকে পুরোদমে প্রস্তুত করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কোনো মানুষ কোনো কিছুতে সফলতা অর্জন করলে দুনিয়ার নিয়মে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত না হয়ে আমরা যেন তার জন্য অন্তর থেকে দু'আ করি। যিনি সফল হয়েছেন তার সাথে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অনুপ্রেরণামূলক কিছু কথা বলতে পারি। একইসাথে, আমরা সফল হওয়া ব্যক্তিকে আমাদের মালিকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নছীহত করতে পারি, যেন সে দুনিয়ার মোহে পড়ে, সফলতার ছোঁয়া পেয়ে তার আসল মালিককে ভুলে না যায়, মালিকের হক্কের ব্যাপারে যেন সে গাফেল না থাকে। সর্বোপরি মালিকের প্রতি যেন অকৃতজ্ঞ না হয়। অন্যদিকে, আমরা যারা এখনও সফল হতে পারিনি, তাদের জন্যও যেন আমরা দু'আ করি, যাতে রব প্রত্যেকের মনের নেক আশা পূরণ করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের পরোপকার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

-মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন

*-অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**

(নভেম্বর'২০ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৭)

প্রশ্ন: কোনো কোনো মুসলিমদেশে সহশিক্ষার প্রচলন আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা একই রুমে পাশাপাশি চেয়ারে বসে ক্লাস করে। এর হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: আমি মনে করি, সহশিক্ষা রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ কারো জন্যই পড়াশোনা করা জায়েয নয়। কারণ, এটি তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতার জন্য হুমকিস্বরূপ। একজন পুরুষ যতই সচ্চরিত্রবান ও সংযমশীল হোক না কেন, তার পাশের চেয়ারে যদি কোনো নারী থাকে, তাহলে ফেতনা থেকে দূরে থাকা তার জন্য খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায়, বিশেষ করে ঐ নারী যদি সুন্দরী ও রূপসজ্জাকারী হয়। আর ফেতনা ও অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এমন সব বিষয়ই হারাম। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম ভাইদেরকে এসমস্ত বিষয় থেকে রক্ষা করেন, যা তাদের যৌবনের জন্য ফেতনা-ফাসাদ ও অনিষ্ট ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন: এসব দেশে যদি পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে কী করবে?

উত্তর: যে দেশে সহশিক্ষা নেই, সেখানে পড়াশোনার জন্য চলে যাবে। আমি এ অবস্থাতেও সহশিক্ষা বৈধ বলতে পারছি না। তবে এ ব্যাপারে অন্য কেউ ভিন্ন মত পোষণ করতে পারে।

প্রশ্ন: কোনো কোনো সমাজে একটা প্রথা চালু আছে, নারীরা হাতে আবরণ দিয়ে পর-পুরুষের সাথে মুছাফাহা করে। এর হুকুম কী? ছোট-বড় সকল নারীর জন্য কি একই হুকুম প্রযোজ্য হবে?

উত্তর: সরাসরি হোক বা আবরণ দিয়ে হোক কোনো অবস্থাতেই পর-পুরুষের সাথে মুছাফাহা করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফেতনা সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'তোমরা যেনার ধারেকাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(আল-ইসরা, ১৭/৩২)*। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যেনার দিকে প্ররোচিত করে এমন সব বিষয় পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, চাই সেটা গুপ্তাঙ্গের অথবা অন্য অঙ্গের যেনা হোক। তবে গুপ্তাঙ্গের যেনা সবচেয়ে মারাত্মক ও গর্হিত অপরাধ। কোনো পর-পুরুষ যদি নারীর হাত স্পর্শ করে, তবে নিঃসন্দেহে তার যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। উপরন্তু হাদীছে পর-পুরুষের সাথে মুছাফাহার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে যুবতী ও বৃদ্ধার মধ্যে হুকুমের কোনো পার্থক্য নেই। সকলের জন্যই পর-পুরুষের সাথে মুছাফাহা করা হারাম। কারণ কথায় বলে, لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ 'প্রত্যেক বর্জিত জিনিসের সংগ্রাহক থাকে'। এছাড়া যুবতী ও বৃদ্ধা নির্ণয়েও মতপার্থক্য হতে পারে। কেউ একজনকে বৃদ্ধা বললে অন্য আরেকজন তাকে যুবতি বলে। অতএব, সকলের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন: পর-পুরুষের সাথে একজন নারীর কতটুকু সম্পর্ক বৈধ এবং কতটুকু অবৈধ তার বিশদ বিবরণ আপনি আমাদের সামনে পেশ করেছেন। কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হলো, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কি বৈধ? নারী-পুরুষ কি একসাথে কাজ করতে পারবে? বিশেষ করে এটা অনেক দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

উত্তর: আমি মনে করি, সরকারি-বেসরকারি যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলে নারী-পুরুষের একসাথে কাজ করা বৈধ নয়। কেননা এর অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। কিছু না হলেও কমপক্ষে এর মাধ্যমে নারীর লজ্জাশীলতা ও পুরুষের ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ইসলামী শরীআহ ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শ পরিপন্থী বিষয়। আপনারা কি জানেন না যে, রাসূল ﷺ নারীদের জন্য ঈদগাহে পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন? নারীরা পুরুষদের সাথে মিলে-মিশে একাকার

* পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

হয়ে যেতেন না। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ পুরুষদের উদ্দেশ্যে খুৎবা শেষ করে নারীদের নিকট যেতেন এবং তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করতেন। এতে বুঝা যায়, নারীরা রাসূল ﷺ-এর খুৎবা শুনতে পেতেন না। আর শুনলেও পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারতেন না।

আপনারা কি জানেন না যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নারীদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার আর মন্দ কাতার হলো প্রথম কাতার। পক্ষান্তরে পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর মন্দ কাতার হলো শেষ কাতার'।[১] মহিলাদের প্রথম কাতার পুরুষদের অধিক নিকটবর্তী হওয়ার কারণে মন্দ কাতার বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষ কাতার পুরুষদের থেকে অধিক দূরবর্তী হওয়ার কারণে সর্বোত্তম কাতার বলা হয়েছে।

ভেবে দেখুন, ইবাদতের ক্ষেত্রে যদি এমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে অন্য ক্ষেত্রে আরো কত সতর্ক হতে হবে! অথচ ইবাদতের সময় মানুষ যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে। ইবাদতের বাইরে নারী-পুরুষের সহাবস্থান নিশ্চয়ই বেশি ভয়ংকর। কারণ, শয়তান বনূ আদমের শিরায় শিরায় বিচরণ করে। অতএব, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের ফলে ভয়ংকর ফেতনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছুই না।

আমি মুসলিম ভাইদেরকে অনুরোধ করব, তারা যেন সহাবস্থান কেন্দ্রীক কর্মস্থল থেকে দূরে থাকে। কারণ, এটা তাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। রাসূল ﷺ বলেন, 'আমার মৃত্যুর পরে পুরুষের জন্য নারীদের থেকে বড় কোনো ফেতনা নেই'।[২] আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা মুসলিম। আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের উচিত, অন্যদের থেকে এক্ষেত্রে পৃথক হওয়া এবং সর্বদা মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, যিনি আমাদেরকে শরীআত প্রণয়নের মাধ্যমে ধন্য করেছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা প্রজ্ঞাবান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শরীআতের অনুসরণ করি, যিনি দেশ ও মানুষের কল্যাণ বিষয়ে সর্বজ্ঞাত। যারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাবে, তারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করবে। আমরা ইদানীং শুনতে পাচ্ছি, যাদের মধ্যে নারী-পুরুষের সহাবস্থান বাধাহীন ছিল, তারা আজ এটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সম্ভবপর চেষ্টা করছে। কিন্তু দূর থেকে তারা কীভাবে এর সমাধান করবে? মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এদেশকে এবং সকল মুসলিম দেশকে সকল প্রকার অনিষ্ট, ক্ষতি এবং ফেতনা থেকে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন: নারীরা কোন কোন কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে, যা তার দ্বীন পালনের জন্য হুমকি হবে না?

উত্তর: শুধু নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে তারা কাজ করতে পারবে। যেমন- মহিলা মাদরাসা বা স্কুলে শিক্ষা, প্রশাসন, প্রযুক্তি ইত্যাদি যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। নারীরা বাড়িতে বসে দর্জির কাজ তথা মেয়েদের পোশাক সেলাইয়ের কাজও করতে পারে। যেসব কর্মক্ষেত্র পুরুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেখানে নারীদের কাজ করা বৈধ নয়। কারণ, সেখানে পুরুষদের সাথে মিশতে বাধ্য হবে। আর এ অবস্থায় ভয়াবহ ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমার মৃত্যুর পর পুরুষদের জন্য নারীদের থেকে বড় কোনো ফেতনা নেই'। অতএব, সকলের উচিত, ফেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্র এবং মাধ্যম থেকে নিজেকে ও পরিবারকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করা।

প্রশ্ন: বর্তমানে যুবকদের মধ্যে একটা বিষয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তা হলো— শিল্পী, গায়িকাসহ বিভিন্ন শ্রেণির নারীদের ছবি সংগ্রহ করে সেগুলোকে উপভোগ করা। তারা দাবি করে, এসব ছবি দেখা বৈধ। কারণ, এগুলো শুধু ছবি, বাস্তব নয়। আমরা এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর: বিষয়টা নিয়ে এ ধরনের শিথিলতা বড়ই বিপজ্জনক। কারণ বাস্তবে দেখা যায়, কোনো মানুষ যখন টেলিভিশন অথবা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে কোনো নারীকে দেখে, তখন অবশ্যই ঐ নারীর প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তাকে সরাসরি দেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। আমরা জানতে পেরেছি, কিছু যুবক সুন্দরী নারীদের ছবি সংগ্রহ করে সেগুলোকে উপভোগ করে। এটা তাদের বড় ফেতনায়

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪০।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৬।

পতিত হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে। অতএব, পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা অন্য কিছুতে নারীদের ছবি দেখা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কেননা এক্ষেত্রে ফেতনার এমন আশঙ্কা আছে, যা তার দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। শুধু তাই নয়, তার অন্তর সর্বাবস্থায় নারীদেরকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকবে। ফলে তাদেরকে সরাসরি দেখাও আরম্ভ করবে।

প্রশ্ন: কোনো মুসলিম অথবা ফাসেক্ব অথবা কাফের নারীর সামনে একজন মুসলিম নারীর লজ্জাস্থানের সীমা কতটুকু?

উত্তর: দ্বীনের ভিন্নতার কারণে একজন নারীর সামনে আরেকজন নারীর লজ্জাস্থানের সীমার পার্থক্য নেই। অতএব, এক্ষেত্রে মুসলিম নারী এবং কাফের নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তেমনিভাবে কোনো সচ্চরিত্রবান নারী এবং ফাসেক্ব নারীর মধ্যেও এ বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তবে যদি অন্য কোনো কারণে নারীকে বেশি সতর্ক থাকতে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো পার্থক্য নেই। তবে আমাদের জানা আবশ্যক যে, নারীর লজ্জাস্থান তার পোশাকের মানদণ্ড নয়। যদিও অন্য নারীর সামনে একজন মুসলিম নারীর লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সে শুধু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পোশাক পরে থাকবে। তবে শালীন পোশাক পরার পরও কোনো কারণে যদি নারীর বুক অথবা স্তন অন্য নারীর সামনে বের হয়ে যায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অন্য নারীর সামনে একজন নারীর লজ্জাস্থান নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত— এ যুক্তি দিয়ে শুধু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পোশাক পরা বৈধ নয়। আর আমার মনে হয় না, কোনো আলেম এমনটা বলতে পারেন।

প্রশ্ন: স্বামীর সামনে রূপসজ্জা করার জন্য ফেস পাউডার ব্যবহারের হুকুম কী?

উত্তর: কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে এগুলো দ্বারা রূপসজ্জা করা বৈধ। এক্ষেত্রে আসল হলো বৈধতা, যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে হারামের দলীল সাব্যস্ত হয়। তবে আমি শুনেছি, ফেস পাউডার নারীর ত্বকে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং খুব অল্প বয়সেই তার ত্বক পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, সাধারণত প্রতিটি কাজের যেমন অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া থাকে, তেমনি দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে যদি প্রমাণিত হয়, এগুলো ব্যবহারে নারীর কোনো ক্ষতি হয় না, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, রূপসজ্জার মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যে স্বামী রূপসজ্জা পছন্দ করে। কেননা সব পুরুষের চাহিদা একরকম নয়। কেউ কেউ সাজসজ্জাকে গুরুত্ব দেয় না। আবার কেউ আছে এগুলোর প্রতি আসক্ত।

নারীদের মাঝে পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় রূপসজ্জা করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন শরীআতের সীমার মধ্যে হয়।

প্রশ্ন: অবিবাহিতা নারীরা কি ফেস পাউডার দিয়ে রূপচর্চা করে অন্য নারীদের মাঝে আসতে পারে?

উত্তর: কোনো কোনো বিদ্বানের মতানুযায়ী অবিবাহিতা নারীদের রূপসজ্জা করা উচিত নয়। কারণ, তাদেরকে রূপসজ্জা করতে বলা হয়নি। একারণে আমিও মনে করি, অবিবাহিতা নারীদের রূপসজ্জা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর বিবাহিতা নারীদের রূপসজ্জা করার হুকুম তো আমি আগেই বলেছি।

প্রশ্ন: নারীদের জন্য বাড়িতে সুগন্ধি দিয়ে বাইরে বের হওয়ার হুকুম কী?

উত্তর: নারীরা যদি বাড়িতে সুগন্ধি মেখে বাজার বা অন্য কোনো জায়গায় বের হয় এবং সুগন্ধি প্রকাশিত হয়, তাহলে এটা জায়েয হবে না। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যদি কোনো নারী সুগন্ধি মাখে, তাহলে সে যেন আমাদের সাথে এশার ছালাতে উপস্থিত না হয়’।[৩] তবে হ্যাঁ, তারা যদি বাড়ির গেটেই গাড়িতে চড়ে যায় এবং কোনো পর-পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ না হয়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: কাফেরদের তৈরি নারীদের পোশাক যদি শরীরকে ভালোভাবে আবৃত করে এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সে পোশাকের হুকুম কী?

উত্তর: ‘সাদৃশ্য অবলম্বনের উদ্দেশ্য’ কথাটি অবান্তর। কারণ সাদৃশ্য হলেই সেটি নিষিদ্ধ হবে। সাদৃশ্য অবলম্বনের

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪৩।

উদ্দেশ্যে করুক বা না করুক। এসব পোশাক যদি কাফেরদের নিজস্ব হয় এবং অন্য কেউ পরিধান না করে, তাহলে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সে পোশাক পরা বৈধ নয়। তবে যদি মুসলিম-অমুসলিম সকলের মাঝে প্রচলিত থাকে কিন্তু আমাদের দেশে না থাকে, তাহলে সেটি পরিধানে কোনো সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য না হয়। কারণ, প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হলে সেটি হারাম।

প্রশ্ন: নারীর পোশাক টাইট এবং খাটো হওয়ার কারণে যদি তার পায়ের নলা মাহরাম পুরুষ এবং অন্য নারীদের সামনে প্রকাশ পায়, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর: আমি আগেও বলেছি, নারীদেরকে এমন পোশাক পরতে হবে, যাতে তার পুরো শরীর ভালোভাবে ঢেকে যায়। যদিও মাহরাম পুরুষ এবং অন্যান্য নারীর সামনে পায়ের নলা বের করা বৈধ, কিন্তু সর্বাবস্থায় লম্বা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা নারীদের উপর আবশ্যকীয় বিষয়। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং পোশাকের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে হবে।

প্রশ্ন: সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যুবতী মেয়েদের মাথার চুল কাটার হুকুম কী?

উত্তর: তারা যদি চুল এমনভাবে কাটে, যাতে পুরুষের সদৃশ হয়, তাহলে তা হারাম। কেননা রাসূল ﷺ পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদেরকে লা'নত করেছেন। এমনিভাবে তাদের চুল কাটা যদি কাফের নারীদের অনুরূপ হয়, তাহলেও তা হারাম। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করলো, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হলো'।[৪] তবে যদি এরকম কোনো কিছু উদ্দেশ্য নাও হয়, তবুও হাম্বলী মাযহাবে এটি মাকরূহ বলে প্রসিদ্ধ। অবশ্য এ মতের স্পষ্ট দলীল না থাকলেও এটাকে গ্রহণ করা সবার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করি। কেননা বৈধ বলে বিষয়টাকে শিথিলভাবে নিলে পর্যায়ক্রমে হারামে পতিত হবে। অতএব হারাম থেকে রক্ষা পেতে মাকরূহ গণ্য করা খুবই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন: বলা হয়, আপনি যখন বুলূগুল মারাম হাদীছগ্রন্থ ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন ওযূর সময় পুরুষের মাথা মাসাহ করার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষ ব্যক্তি মাথার অগ্রভাগ থেকে পিছন পর্যন্ত, অতঃপর পিছন থেকে আবার অগ্রভাগ পর্যন্ত মাসাহ করবে, যাতে পানি চুলের ভিতর পৌঁছে যায়। এ কথা কি সঠিক? নারীদের ক্ষেত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য হবে? কেননা তাদের চুল লম্বা এবং ঘন হওয়ার কারণে এটি তাদের জন্য অনেক কঠিন।

উত্তর: হ্যাঁ! আমি বলেছি, মাথা মাসাহ করার সময় মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে পিছন পর্যন্ত, অতঃপর পিছন থেকে আবার অগ্রভাগ পর্যন্ত মাসাহ করবে। কারণ, এটা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু চুলের ভিতরে পানি পৌঁছানোর কথাটা আমার উপর মিথ্যারোপ। আমি এটা বলিনি। মাসাহর মাধ্যমে পানি চুলের ভিতরে পৌঁছানো অসম্ভব। কারণ মাসাহ হলো, পানিতে হাত ভিজিয়ে মাথায় সে হাত স্পর্শ করা। এর মাধ্যমে পানি চুলের ভিতরে পৌঁছবে না। তবে মাথা নাড়া করা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এক্ষণে প্রশ্ন হলো, মাথা মাসাহর এই পদ্ধতি কি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? হ্যাঁ! কারণ শারঈ আহকাম এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, পুরুষের জন্য যে হুকুম সাব্যস্ত হবে, নারীদের জন্যও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। তেমনিভাবে নারীদের জন্য যে হুকুম সাব্যস্ত হবে, পুরুষের জন্যও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যের কোনো দলীল পাওয়া গেলে সেটা ভিন্ন কথা। মাথা মাসাহর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্যের কোনো দলীল আছে বলে আমার জানা নেই। অতএব, নারীরাও মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে পিছন পর্যন্ত মাসাহ করবে। তাদের চুল যতই বড় হোক না কেন হুকুমের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ, মাথা মাসাহ অর্থ এই নয় যে, শক্তি দিয়ে চুলে চাপ দিবে যাতে চুল ভিজে যায় অথবা ভিতরে পানি চলে যায়; বরং উচিত হলো, আস্তে আস্তে মাসাহ করা।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

জেরুযালেম ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস: ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(শেষ পর্ব)

শান্তির ললিতবাণী প্রচারকরা কোথায়?

সন্ধ্যার মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘুমাতে যাওয়া আর পাখির কোলাহলে আনন্দঘন পরিবেশে ঘুমজাগা শিশুটি যখন নিমিষেই হচ্ছে পিতৃহারা, মায়েরা হচ্ছে সন্তানহারা, স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীহারা; পিতৃহারা সন্তানের বুকফাটা আর্তনাদ, স্বামীহারা বিধবার গগণবিদারী চিৎকার, সন্তানহারা পিতার শোকের মাতম যখন পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলেছে, সকলের অলক্ষ্যে নির্যাতিত বান্দার আর্তচিৎকারে আল্লাহর আরশও যেন কেঁপে উঠেছে, সমগ্র পৃথিবী যখন এ গণহত্যায় শোকে মূহ্যমান সেই মুহূর্তেও **মার্কিন প্রেসিডেন্ট** নির্লজ্জভাবে উল্টো সহায়হীন ফিলিস্তীনীদের দায়ী করে বিষোদগার করেন। অন্যদিকে শপথ না নেওয়ার ঠুনকো অজুহাতে চুপটি মেরে ঠিকই বসে ছিলেন তথাকথিত 'পরিবর্তন' এর বার্তা নিয়ে হাজির হওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

শান্তির বার্তাবাহক (!) তকমা লাগিয়ে এই আমেরিকাই আবার পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তার দারস দিয়ে যাচ্ছে। শিশু ও নারীর অধিকারের পক্ষে অবিরাম বুলি আওড়াচ্ছে। অথচ দীর্ঘ ৬২ বছর যাবৎ ফিলিস্তীনের বুকে যে অন্তহীন কান্নার প্রস্রবণ বয়ে চলেছে, তা তাদেরকে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটে না। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে সবসময় সোচ্চারভাবে প্রচারিত হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে তথাকথিত নারী নির্যাতনের কাহিনী। কিন্তু ইসরাঈলের প্রকাশ্য লোমহর্ষক নারকীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা মুখে কুলুপ এঁটে আছে। হাজারো মানবাধিকারবাদী, নারীবাদী, প্রাণীবাদী সংস্থা যারা দেশে দেশে মানব-প্রাণিকুল নির্যাতনের চিত্র সন্ধানে হয়রান হয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের কাছেও ফিলিস্তীনী নারী ও শিশুর বুকফাটা আর্তনাদ কোনোই প্রভাব ফেলে না। তবে কি মুসলিম নারী ধর্ষণ মানবতাবিরোধী কাজ নয়? মুসলিমদের উপাসনাস্থল ধ্বংস করা কি ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা নয়? নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করা কি গণহত্যা নয়? কেন শান্তির ললিতবাণী প্রচারকরা এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে? কেন তাদের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের হুংকার সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়? এভাবেই কেবল আপন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরগরম গণতন্ত্র, শান্তি ও নিরাপত্তার ভড়ংধারী এই রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বের উপর চালিয়ে যাচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক নীরব গণহত্যা।

মুসলিম বিশ্বের নীরবতা : গাযার নিরীহ নির্যাতিত সম্বলহারা ভাইয়ের বুকফাটা আর্তনাদ যখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মুসলিমদের চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করছে, তখন মুসলিম বিশ্বের শাসকদের কাপুরুষোচিত নীরবতা যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা! বিশেষ করে আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের সুবোধ তল্পিবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আজ মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদেরকে পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে তাদের মনোরঞ্জনে নিয়োজিত রয়েছে। যে মুহূর্তে পবিত্র বায়তুল আক্বছায় ইয়াহূদীদের সিনাগগ তৈরি হচ্ছে, মুসলিম ভাইদের উপর অকথ্য যুলম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তাদেরকে মরু বিয়াবানে শিয়াল-কুকুরের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, প্রতিবাদ করতে গেলে বুলেট-বোমায় বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, ট্যাংকের চাকায় পিষে মারছে, উদ্বাস্তু শিবির গুড়িয়ে দিচ্ছে, পাইকারিভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে; সেই মুহূর্তে আমাদের কাপুরুষ, হীন নেতাদের উপদেশবাণী (?) হলো ওদের হাতে পারমাণবিক বোমা আর মিসাইল, আকাশে ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য, দরিয়ায় তাদের সুবিশাল নৌবহর, জমিনে ওদের ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান, দুনিয়াটা ওরা নিমিষে খতম করে দিতে পারে, ওদের মোকাবেলা করতে গিয়ে খামোখা তাজাপ্রাণ, মাল-সম্পদ নষ্ট করে লাভ কী?

হে কাপুরুষ মুসলিম শাসক! ঐ শোনো ধর্ষিতা বোনের কান্না। ঐ শোনো ইয়াতীম শিশুর বুকফাটা আহাজারি। শোনো ঐ আশ্রয়হীন ছিন্নমূল লাখো দুস্থ, দুর্গত, নির্যাতিত, নিগৃহীত মুসলিম ভাইয়ের ক্রমাগত আর্তনাদ। শোনো ঐ ক্ষুধার্ত বুভুক্ষু মা-বোনদের আর্তচিৎকার। ওরা যাবে কোথায়? খাবে কী? ওদের অশ্রুসিক্ত নয়ন তো তোমাদের পানে চেয়ে আছে। বলো কী করবে?

আশ্রয়হীন ক্রন্দনরত নারী-শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ত-মাংস, অস্থিমজ্জা একাকার করে দেওয়ার পর শাসকদের এই যখন অবস্থা। এইভাবে এক গালে চড় মারার পর আরেক গাল পেতে দেওয়ার দৃশ্যে মহা গদগদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবার কেবল চড়-থাপ্পড় নয়, জোড়া পায়ে লাথি মারতে শুরু করেছে। এই সুযোগে কেবল গাযা-পশ্চিম তীর নয়, ইরাক-আফগানকে একসাথে ধুলায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীরা। মানবতার অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে বিশ্বসংস্থার জন্ম, সেই জাতিসংঘে মুসলিম শাসকদের মহামান্য গুরু আমেরিকা ইসরাঈলের নৃশংসতার বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাবও যখন পাশ করতে দেয় না, তবুও কেন আমেরিকার কদমবুসি করে চলতে

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

হবে? ১৫৫ কোটি মুসলিম আর কতকাল এভাবে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে অসহায় হয়ে চেয়ে থাকবে? কতকাল আর হাত-পা গুটিয়ে শির নুইয়ে অশ্রুপাত করবে?

সমাধান কোন পথে?

ফিলিস্তীন-ইসরাঈল সমস্যার সমাধান হতে পারে দুইভাবে— শান্তিপূর্ণ সমাধান অথবা রক্তক্ষয়ী সমাধান।

শান্তিপূর্ণ সমাধান: শান্তিপূর্ণ সমাধানের নামে ফিলিস্তীনীরাও বাধ্য হয়ে আমেরিকার দেওয়া রোডম্যাপ অনুযায়ী যে প্রস্তাব মেনে নিয়েছে তা হলো দ্বি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ। কিন্তু এই সমাধানেও কয়েকটি বাধা রয়েছে। তা হলো জেরুযালেমকে রাজধানী বানানো নিয়ে। ইসরাঈল ও ফিলিস্তীন উভয়েই চায় জেরুযালেমকে রাজধানী বানাতে এবং বায়তুল আক্বছাকে নিজেদের অধীনে রাখতে। এছাড়া আরেকটি বড় বাধা সৃষ্টি করছে ইসরাঈল। তারা প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৯৬৭ সালের সীমানায় ফিরে যাওয়া তো দূরে থাক বরং দখলকৃত স্থানে আরো বসতি স্থাপন করছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো আমেরিকা-ইউরোপ যদি ইসরাঈলের প্রতি এতই দরদি হয়, তাহলে নিজের ঘরে জায়গা দিচ্ছে না কেন? কেন অন্যায়ভাবে রক্তগঙ্গা বইয়ে অপরের জমি দখল করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে শান্তির বাণী প্রচারকদের? ফিলিস্তীনে সত্যিই কি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্বেগ তাদের রয়েছে?

রক্তক্ষয়ী সমাধান: এই পৃথিবীর প্রতিটি সচেতন মানুষ জানে যে, ফিলিস্তীন ফিলিস্তীনীদেরই। ইসরাঈল ও বর্তমান ফিলিস্তীন পুরোটাই দশ সহস্রাধিক বছরের ঐতিহাসিক জাতি ফিলিস্তীনীরা। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসরাঈলের অধিকৃত জমি পুরোটাই ফিলিস্তীনীদের। এটা পুনরায় উদ্ধার করা তাদের কর্তব্য। এই অধিকার আদায়ের স্বার্থে যদি ফিলিস্তীনীরা প্রতিনিয়ত ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যায় এতে আপত্তির কোনো সুযোগ নেই। স্বাধীনতা যদি মানুষের জন্মগত অধিকার হয়, তাহলে সদ্য জন্ম নেওয়া ফিলিস্তীনী শিশুটিরও এ অধিকার রয়েছে। অতএব, যতই রক্তক্ষয়ী হোক না কেন এই পথে স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া আর কোনো বাস্তবসম্মত পথ নেই।

ইসরাঈলের ধ্বংস সুনিশ্চিত: সূরা আল-আ'রাফের ১৬৮ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহূদীরা কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি তারা ইসরাঈল নামে একটি নিজস্ব রাষ্ট্র সৃষ্টি করে প্রায় ৬০ বছর ধরে সমবেত হচ্ছে। মূলত, ইসরাঈল কখনোই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনি মাত্র। এই বশংবদ কলোনিটিকে রাষ্ট্র নাম দেওয়াটাও বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক খেলা। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বর্তমান ইসরাঈলে তাদের জমা হওয়াটা চূড়ান্ত ধ্বংসের আলামত হতে পারে এবং এই আলামত ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। ইসরাঈল এর সত্যিকারের বিপদ, আসল হুমকি তার ঘরের মধ্যেই মাথাচাড়া দিচ্ছে। ইসরাঈলের মোট জনসংখ্যা ৭.১ মিলিয়ন। তন্মধ্যে ইয়াহূদী ৫.৫ মিলিয়ন আর বাকী ১.৬ মিলিয়ন মুসলিম। গাযা ও পশ্চিম তীরে বসবাসকারী সব মুসলিম মিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫.৫ মিলিয়ন। এখনই মুসলিমরা ইয়াহূদীদের থেকে ১ লাখ বেশি।[১] তথা জনসংখ্যার বিচারেই একদিন ইসরাঈল হুমকির মুখে পড়বে। এমনিতেই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে। তাইতো অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, ফিলিস্তীনীদের উচিত দ্বৈত-রাষ্ট্র (Two States) সমাধানের আশা বাদ দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাতে যদিও কয়েক দশক লেগে যাবে; কিন্তু এতে ইসরাঈলীদের বিপদ ঘটবে।

এছাড়া এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, অত্যাচার করে কেউ কোনোদিন টিকে থাকেনি। বরং অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ইসরাঈলও একদিন ধ্বংস হবে। কেননা শত সহস্র শহীদের পথ থেকে ফিলিস্তীনীরা একচুল সরে দাঁড়ায়নি। পুরনো প্রজন্মের ফিলিস্তীনীরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সামান্যতম আপসকামিতা দেখায়নি। শহীদের রক্ত, বোমায় ঝাঁঝরা হওয়া শরীর কথা বলতে শুরু করেছে। শরণার্থী শিবিরে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুটাও মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। শহীদ হওয়ার মাঝে যে জাতি আনন্দ পায় তাদেরকে হত্যা করা যায়, ধ্বংস করা যায় না। অবরুদ্ধ করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতার আকাশছোঁয়া স্বপ্নচ্যুত করা যায় না। হয়তো অচিরেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে। আল্লাহর নবী ﷺ ও বলে দিয়েছেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না মুসলিমেরা ইয়াহূদীদের সাথে লড়াই করবে। তারা ইয়াহূদীদের হত্যা করবে। ইয়াহূদীরা পাথরখণ্ড ও গাছের আড়ালে লুকাবে। তখন পাথর ও গাছগুলো বলবে, হে মুসলিম! এই যে ইয়াহূদী আমার পিছনে। এসো, ওকে হত্যা করো'।[২] তাই হতে পারে ফিলিস্তীনে তাদের জমা হওয়াটা চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্ব আলামত।

পরিশেষে বলব ফিলিস্তীন মুসলিমদেরই। বায়তুল আক্বছা মুসলিমদেরই। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আর সত্যিই মুসলিম শাসকদের যদি কখনো সুমতি হয়, তবে প্রতিটি বিবেকবান মুসলিম আত্মা চলমান অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের ঈমানী দায়িত্বে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের পাঞ্জেরীদের সঠিক চেতনা দান করুন- আমীন!

---

১. Can Israel Survive? টিম ম্যাকগাক, দি টাইম ম্যাগাজিন, ১৯ জানুয়ারি; অনুবাদ: ইফতেখার আমিন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৯ জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৬।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮২, 'কিতাবুল ফিতান'; মিশকাত, হা/৫১৪৪।

কুরআন পড়ো

-জিশান মাহমুদ
শ্রীবরদী, শেরপুর।

কুরআন পড়ো সকাল-বিকাল অর্থ বুঝে বুঝে
কুরআন দেখায় সরল এক পথ নিতে হবে খুঁজে।
কুরআন পড়লে মনের ঘরে জ্বলে নূরের আলো
কুরআন পড়লে শুদ্ধভাবে পরকাল হয় ভালো।
কুরআন পড়লে বাড়ে যে মান আল্লাহ তাআলার কাছে
কুরআন পড়ে নাস্তিক বলে সৃষ্টিকর্তা আছে।
কুরআন পড়ো কাজের ফাঁকে কুরআন জীবন গড়ে
দশটি নেকী পাবে তুমি প্রতি হরফ পড়ে।
কুরআন পড়লে ক্বিয়ামতে সহজ হবে খোঁজা
হেলায় ফেলায় দিন কাটালে বাড়ে পাপের বোঝা।
কুরআন পড়ে পুণ্য কামাও জীবন হবে ধন্য
কুরআন পড়ো ছহীহভাবে পরকালের জন্য।

বেপর্দা নারী

-মুরসালিন বিন শরীফুল ইসলাম
৭ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

হে শয়তানের ছদ্মবেশী নারী!
নগ্ন পোশাকে করছ ঘোরাঘুরি।
তোমাদের নাই যে কোনো লাজ
তরুণদের নাশ করাই তোমাদের কাজ।
নগ্নতার জন্য যুবকেরা করছে দর্শন
তাই আকৃষ্ট হয়ে করছে তোমাদের ধর্ষণ।
তোমরা ঢাকো না শরীর ঢাকো না মুখ
যুবকদের আকৃষ্ট করে পাচ্ছ কি খুব সুখ?
নগ্ন হয়ে ভূবনে আছো খুব হাসিখুশি
তাই নারীই হবে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী।
নিজেদের ফটো ছাড়ছ মোবাইল-ফোনে
যখন কুমন্ত্রণা দিচ্ছে শয়তানে।
তোমরা ঘুরছ চুলের বেণি ছেড়ে
এর দ্বারা যুবকের মনকে নিচ্ছ কেড়ে।
মান্য করছ না যে দ্বীনী কোনো বিধান
তাই নাশ করছ নিজেদের মান।
নগ্ন নারী ক্বিয়ামতের আলামত
তোমরা লজ্জাস্থানের করবে না হেফাযত?
নিজেকে দাবি করো মুসলমান
কিন্তু অন্তরে নেই ঈমান।
সুখ যদি পেতে চাও
তবে পর্দানশিন হয়ে যাও।
প্রভু জান্নাত দিবেন উপহার
সেখানে যেতে মন চায় সবার।

শরৎ আগমন

-মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম
ফাযিল (ডিগ্রি) ২য় বর্ষ, ছারছীনা আলিয়া মাদরাসা,
আমতলী, বরগুনা।

পাখির কণ্ঠে কিচিরমিচির
আকাশে মেঘের ভেলা,
ঋতুর রানি এসেছে ধরায়
কাশফুলেরই মেলা।
গাছে গাছে সবুজ পাতা
প্রকৃতিটা চমৎকার,
দক্ষিণা বাতাসে ভেসে আসে
ফুলের ঘ্রাণ যাযাবর।
কৃষক কাঁধে জোয়াল নিয়ে
মাঠের বুকে যায়,
দস্যু ছেলে মাছ ধরবি
শরৎ এসেছে ধরায়।

প্রাণের বাংলাদেশ

-বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম
৫ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

এই ধরণির সবুজ শ্যামল
ছোট্ট একটি দেশ
নাম কি তাহার বলো দেখি
প্রাণের 'বাংলাদেশ'।
যেদিকে তাকাই বন-বনানী
দেখতে লাগে বেশ
নদী-নালা, খাল-বিলের
সোনার বাংলাদেশ।
শস্য-ফসল আর শাক-সবজি
সবই রবের দান
আম, কাঠাল আর জাম, লিচুতে
ভরে মোদের প্রাণ।
সকল দেশের রানি সে যে
মহান রবের দান।

বাংলাদেশ সংবাদ

অনলাইন জুয়ায় জড়িত দেশের অর্ধকোটি মানুষ

দেশের অর্ধকোটি মানুষ অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসে যে অনলাইন জুয়া খেলা হয় তার মোট ২ হাজার ৬০০টি জুয়ার সাইট ব্লক করা হয়েছে এবং মোবাইল অ্যাপগুলো প্রতিনিয়ত ব্লক করা হচ্ছে। এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, চলতে থাকবে'। 'সরকার জুয়ার সাইট বন্ধ করছেন, দুষ্টচক্র আবার অন্যভাবে খুলছে'— এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, 'সেটা নিয়ে আমরা যৌথভাবে বসেছিলাম। আমরা ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকম, ন্যাশনাল টেলিকম মনিটরিং সেন্টার, কম্পিউটার কাউন্সিল, বিটিআরসি এবং সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি— সবাইকে নিয়ে বসেছিলাম। যার যতটুকু সক্ষমতা আছে, পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্স, সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে একটা ড্রাইভ দিচ্ছি'।

উচ্ছৃঙ্খল হিজড়াদের দমাতে ডিএমপির অল-আউট অ্যাকশন

রাজধানীতে হিজড়াদের উৎপাত, দৌরাত্ম্য নতুন নয়। রাস্তার সিগনাল, যানবাহন, বাসাবাড়ি, দোকানপাটসহ আবাসিক এলাকায় হিজড়াদের চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রায় শোনা যায়। বিশেষ করে হিজড়াদের চাহিদামাফিক টাকা না দিলে নানা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে তারা বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, বর্তমানে দেশে প্রকৃত হিজড়ার সংখ্যা ১২ হাজার ৬২৯ জন। অথচ রাজধানীতে অর্ধশতাধিক হিজড়ার আস্তানা আছে। এসব আস্তানায় 'গুরু মা'র অধীনে ১৫ থেকে ২০ হাজার হিজড়া আছে। এদের অনেকে প্রকৃত পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও হিজড়ার বেশ ধারণ করে দৈনিক লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করছে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে রাতের আঁধার নামলেই এদের অনেকে দেহবৃত্তি, ছিনতাই ও মাদকব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ পর্যন্ত কেউ এদের নিপীড়ন ও উৎপাত থেকে মুক্ত নয়। এক পুলিশ সদস্যকে হত্যার পর পুলিশের এক অভিযানের সময় ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার বলেন, '...উচ্ছৃঙ্খল এই হিজড়াদের বিরুদ্ধে অল-আউট অ্যাকশন শুরু করেছে ডিএমপি। আমাদের টার্গেট হিজড়াদের উৎপাত পুরোপুরি বন্ধ করা'।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

গাজা যুদ্ধে ইসরাঈলকে ডলার দিয়েছে অ্যাপল

ইসরাঈলের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জড়িত অলাভজনক সংস্থাগুলোতে অনুদান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে অ্যাপলের বর্তমান ও সাবেক কর্মী এবং শেয়ারহোল্ডারদের একটি দল কর্তৃপক্ষকে খোলা চিঠি দিয়েছেন। গাজা উপত্যকায় ইসরাঈলী সামরিক আক্রমণ এবং পশ্চিম তীরে বেআইনি বসতি সম্প্রসারণে জড়িত সংস্থাগুলোতে অ্যাপল অনুদান দেয় বলে অভিযোগ আসার পর তারা প্রতিবাদ হিসেবে এই চিঠি দেন। যে সব দাতব্য সংস্থা অ্যাপলের ডলার-ম্যাচিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুদান পেয়েছে তাদের একটি 'ফ্রেন্ডস অব দ্য আইডিএফ'।

গাজা যুদ্ধ শুরুর পর ব্রিটেন শতাধিক অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স দিয়েছে

গাজা যুদ্ধ শুরু হবার পর ব্রিটেন ইসরাঈলে অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স দিয়েছে ১০৮টি। এসব লাইসেন্সের মধ্যে ৩৭টি সামরিক অস্ত্র সরঞ্জাম ও ৬৩টি বেসামরিক। এসব অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ বছরের মে মাসের মধ্যে। ব্রিটেন থেকে ইসরাঈলে অস্ত্র রপ্তানি হচ্ছে ৩৪৫টি লাইসেন্সের মাধ্যমে। অস্ত্র ছাড়াও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি রপ্তানি হচ্ছে ইসরাঈলে। ব্রিটেনের বাণিজ্য বিভাগ বলেছে ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে সংসদীয় ও জনস্বার্থেই দেশটি ইসরাঈলে অস্ত্র রপ্তানির জন্য এসব লাইসেন্স অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া ইসরাঈলে অস্ত্র রপ্তানির জন্যে আরো ১৮৫টি লাইসেন্স অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ২০২২ সালে ইসরাঈলে ব্রিটেন ৪২ মিলিয়ন পাউন্ডের অস্ত্র রপ্তানি করে। ২০০৮ থেকে ৫৭০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের অস্ত্র রপ্তানি করা হয়েছে ইসরাঈলে। ইসরাঈলে রপ্তানি করা ব্রিটিশ অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস, এ্যাসাল্ট রাইফেল, সামরিক বিমান। বিশ্বে ব্রিটিশ অস্ত্র রপ্তানির শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ অস্ত্র রপ্তানি হচ্ছে ইসরাঈলে।

গোপনে ইসরাঈলে অস্ত্র রফতানি করছে ভারত

ফিলিস্তীনী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগঠন হামাসকে নির্মূলের অভিযানের মাঝে ভারতের কাছ থেকে রকেট ও বিস্ফোরক পেয়েছে ইসরাঈল। ৬ জুন নুসেইরাত আশ্রয়শিবিরে

ইসরাঈলী বোমাহামলার পর ফিলিস্তীনী কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক একটি ভিডিও প্রকাশ করে। সেখানে ইসরাঈলী যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়। ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষে পরিষ্কারভাবে একটি লেবেল দেখা যায়, যেখানে লেখা ছিল, ‘মেইড ইন ইন্ডিয়া (ভারতে নির্মিত)’।

মুসলিম বিশ্ব

মুসলিমদের ইতিহাস মুছতে সাড়ে ৩ হাজার গ্রামের নাম বদলে দিল চীন

নরওয়ের একটি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে চীনের উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে কাজ করে আসছে। সম্প্রতি এই সংস্থাটির সঙ্গে যৌথভাবে চীনা উইঘুরদের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সেখানে বলা হয়েছে, নিজেদের কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করতে শিনজিয়াং প্রদেশে ৩ হাজার ৬০০টি গ্রামের নাম বদলে দিয়েছে চীনা প্রশাসন। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে জাতীয় পরিসংখ্যান বিভাগে নথিভুক্ত ২৫ হাজার গ্রামের নাম নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে সংস্থা দুটি। সেখানে তারা দেখতে পেয়েছে, ৩ হাজার ৬০০টি গ্রামের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬৩০টি গ্রাম সরাসরি উইঘুর মুসলিমদের বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের গ্রামের নামের সঙ্গে উইঘুর বা মুসলিম সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট শব্দ যুক্ত ছিল। সেই শব্দগুলো বাদ দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছে। শিনজিয়াং অঞ্চলে এভাবে আরও বহু গ্রামের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু অন্যান্য জনগোষ্ঠীর গ্রাম আছে বলেও মনে করা হচ্ছে। মূলত উইঘুরদের ঐতিহ্য ধ্বংস করতেই একাজ করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে। চীন-কাজাখস্তান সীমান্তে প্রায় এক কোটি উইঘুর মুসলিম বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আসছে। এ নিয়ে চীনকে সতর্ক করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরিস্থিতির বড় কোনো বদল ঘটেনি বলেই মনে করা হচ্ছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

হাইড্রোজেন হতে পারে আগামীর জ্বালানি

জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে। এ থেকে নিঃসৃত কার্বন পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসের বহুমুখী করার দিকে নজর দিচ্ছে বিশ্ব। তাই সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তির পাশাপাশি হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়ার মতো অপ্রচলিত জ্বালানির দিকেও নজর দিতে হবে। বিশেষ করে হাইড্রোজেন হতে পারে আগামীর জ্বালানি, যা কার্বন দূষণ থেকে বিশ্বকে মুক্তি দিতে পারে। গত জুন মাসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত তিন দিনের আন্তর্জাতিক জ্বালানি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সামিটে বিশ্বের ৩০ দেশের জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকরা অংশ নিয়েছেন। প্রদর্শনীতে অংশ নেয় দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠান। এই আসরে ভবিষ্যৎ জ্বালানি এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এলএনজি গ্যাস, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপর জোর দিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। জাপান ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্য করতে চায়। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে দেশটির খরচ হতে পারে ১ ট্রিলিয়ন ডলার। পাশাপাশি জাপান প্রযুক্তি ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে এশিয়াকেও এ কাজে নেতৃত্ব দিতে চায়। এরই মধ্যে এশিয়া জিরো এমিশন কমিউনিটির (এজেডইসি) সদস্য ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া, ব্রুনাই, মিয়ানমার ও লাওসের সঙ্গে জাপান নানা রকম সহযোগিতায় যুক্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি নিরাপত্তা কাঠামো গঠনে জাপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে এলএনজির ক্ষেত্রে জাপান বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যতে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ২০২৮ সাল থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর কর আরোপ করা হবে। বায়ুশক্তি থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে জাপান ১০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায়। হাইড্রোজেনসহ দূষণমুক্ত জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও উদ্যোক্তাদের এসব উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান নিতে দেখা গেছে।

দাওয়াহ সংবাদ

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ

'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর দাওয়াতী প্লাটফর্ম 'আদ-দাওআহ ইলাল্লহ' সারা দেশব্যাপী দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দিতে মসজিদভিত্তিক মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে আসছে। 'প্রতিটি মসজিদ হোক দ্বীনি শিক্ষার প্রথম পাঠশালা' এই স্লোগানকে সামনে রেখে অভিযাত্রা শুরু করে। কাফেলাকে শক্তিশালী করতে শিক্ষকদের বিনামূল্যে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যা গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. শুরু হয়ে বর্তমান অবধি চলমান। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত মোট ১০টা ব্যাচে প্রায় ২৬৯ জন মক্তব শিক্ষক ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ৭ দিন; ভেন্যু: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী। *(সর্বশেষ তথ্য: ৫ জুলাই পর্যন্ত)*

কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা কোর্স

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে 'আদ-দাওয়া ইলাল্লহ'। গত রামাযানে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা '২০ দিন মেয়াদী' মদীনা ও বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আকীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শব-গুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ৩৩ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় বছর জুড়ে চলমান রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২৪ জনের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় ব্যাচ ৪ঠা মে থেকে শুরু হয়ে ২৩শে মে, ২০২৪ খ্রি. সমাপ্ত হয়। তৃতীয় ব্যাচ ২৯শে জুন থেকে হয়ে ১৮ই জুলাই ২০২৪ খ্রি. শেষ হয়। এতে ৩০ জন অংশ নেয়। চতুর্থ ব্যাচ শুরু হবে ২৪শে আগস্ট, ২০২৪ খ্রি. ইনশাআল্লাহ। উক্ত কোর্সে ভর্তিচ্ছু দ্বীনি ভাইগণ নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করেত পারেন। ০১৪০৭-০২১৮১৪; ০১৪০৭-০২১৮১৫; (WhatsApp) ০১৪০৭-০২১৮৪৮।

শোক সংবাদ

১৫ জুন, ২০২৪ (শনিবার): 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব শাহাদাত হোসেন বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৫ই জুন দুপুর ১২ : ৩০ ঘটিকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অধীন পরিচালিত অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আল-জামি'আহ আস-লাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী উভয় প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তার পরামর্শ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি ভাইস চেয়ারম্যানের গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নীরব, নিভৃতচারী, প্রচারবিমুখ এই মহান ব্যক্তি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের অসংখ্য দ্বীনী কাজে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর এ সকল সৎ ও মহৎ কাজকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আমলনামায় ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন, তার কবরকে প্রশস্ত করুন, তাকে জান্নাতে উঁচু মাক্বামে আসীন করুন। আমীন! তাঁর জানাযার প্রধান জামাআতের ইমামতি করেন শায়খ আব্দুল আলীম ইবেন কাওছার মাদানী। উক্ত জামাআতে উপস্থিত ছিলেন নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সেক্রেটারি মোস্তফা কামাল, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক-সহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দায়িত্বশীলবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশ'-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ হজ্জ সফরে থাকায় জানাযার ছালাতে অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রধান সম্পাদকের হজ্জ সফর

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহর মহাপরিচালক ও মাসিক আল-ইতিছামের প্রধান সম্পাদক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ গত ২২ মে, ২০২৪ খ্রি. ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সঊদী আরবে স্বপরিবারে যাত্রা করেন।

শায়খ উক্ত হজ্জ সফরে প্রবাসী দ্বীনী ভাইদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রিয়াদ, ইয়াম্বু, মক্কা, জেদ্দাসহ মদীনার বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো: ২৪ মে, কিং খালেদ ইসলামিক সেন্টার, উম্মুল হামাম, রিয়াদ; ২৯ মে, এস্তেরাহা সাদিম, সুক মক্কা, বুরাইদাহ, আল-কাসিম; ৩ জুন, হোটেল রায়হানা আত-তাইসীর, মক্কা; ৬ জুন, ইসলামী সম্মেলন সিডার ক্যাম্প, আর-রহমানিয়া, জেদ্দা; ৭ জুন, ইসলামী সম্মেলন, রুসেফাত, মক্কা; ১৪-১৯ জুন, হজ্জ সম্পাদন; ২১ জুন, ইসলামী সম্মেলন, মদীনা; ২৩-২৫ জুন মদীনার উলামায়ে দ্বীনের আমন্ত্রণে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন; ৩০ জুন, আল-মাজমা ইসলামী দাওয়া সেন্টার, রিয়াদ; ১ জুলাই, হজ্জ সফরের শেষ প্রোগ্রাম, মক্কা।

উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে প্রবাসী দ্বীনী ভাইদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল। এছাড়াও তিনি মদীনা ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ড. যায়েদ আল-জুহানী হাফিযাহুল্লাহ-এর বিশেষ আমন্ত্রণে তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত দাওয়াতে আরো উপস্থিত ছিলেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু প্রবীণ ওস্তাযগণ— আক্বীদা বিশেষজ্ঞ শায়খ সঊদ বিন আব্দুল আযীয আদ-দাজান হাফিযাহুল্লাহ, হাদীছ বিশারদ ড. আব্দুল্লাহ আস-সুমরানী হাফিযাহুল্লাহ, ভাষা অনুষদের সাবেক ডিন ভাষাবিদ ড. আব্দুল খালেক আয-যাহারানী হাফিযাহুল্লাহ, শায়খ মানছূর আল-খালাফ হাফিযাহুল্লাহ, বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও ইতিহাসবিদ ড. বুরাইক আবূ মায়েলা আল-হারবী হাফিযাহুল্লাহ প্রমুখ। মদীনা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জুহানী পরিবারের পারিবারিক খামারবাড়ি (খেজুর ও কমলার বাগান) ঘুরে দেখান। জুহানী বংশের ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের বিগত ১৪০০ বছরের জুহানী বংশের ইতিহাস ও কালের পরিক্রমায় তাদের বসতভিটা পরিদর্শন করেন। খেজুরবাগানে পৌঁছালে ড. জুহানীর ছোটভাই ছালাহ আল-জুহানী শায়খকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশে তার ভাইয়ের দীর্ঘ সফর ও আপ্যায়নের কথা উল্লেখ করে শায়খের শুকরিয়া আদায় করেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মিশরে অবস্থিত ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করে দেশে ফিরবেন ইনশাআল্লাহ। *(তথ্য: ৫ জুলাই পর্যন্ত)*

উল্লেখ্য যে, শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ এই বছর সঊদী আরবের সম্মানিত বাদশাহ খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন সালমান বিন আব্দুল আযীযের পক্ষ থেকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ সফরের অমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিষয়টি সঊদী দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানোর পূর্বেই শায়খ হজ্জ সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। আমরা নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও তার সকল অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে সঊদী আরবের সম্মানিত বাদশাহর উক্ত আমন্ত্রণের জন্য শুকরিয়া আদায় করি।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): যাদের সন্তান হয় না, তাদেরকে নিয়ে সমাজে হাসিঠাট্টা করা হয়। এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: সন্তান-সন্ততি দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা করেন সন্তান দেন না। সুতরাং এগুলো নিয়ে হাসিঠাট্টা করা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আসমানসমূহ ও যমিনের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান' (আশ-শুরা, ৪২/৪৯-৫০)। আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। এটাও তাঁর একটি পরীক্ষা। এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত। আল্লাহ বলেন, 'যারা ছবরকারী, তাদের অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে' (আয-যুমার, ৩৯/১০)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারীর জান, সন্তান-সন্ততি ও তার ধন-সম্পদ (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষিত হতে থাকে। পরিশেষে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে সাক্ষাৎ করবে' (তিরমিযী, হা/২৩৯৯)।

প্রশ্ন (২): জিনদের মাঝে কেউ কি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবী ছিলেন?

মো. খোরশেদ মাসুদার রহমান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: হ্যাঁ, জিনদের মাঝে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবী ছিল। যারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছে এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছে। তারা ছাহাবীর মাঝে গণ্য। ছাহাবীর সংজ্ঞা হলো, যে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঈমান অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছে এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে (নুযহাতুন নাযর, পৃ. ১৮৯)। আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতির কাছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন এবং জিনদের মাঝে যেমন মুমিন রয়েছে এবং তেমন কাফেরও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলো, আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। যা সত্যের দিকে হেদায়াত করে; ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না' (আল-জিন, ৭২/১-২)। ইবনু হাযম বলেন, ছহীহ মুসলিম এ বিষয়ে মতভেদ করতে পারে না যে জিনদের মাঝে একদল রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে কুরআনকে মিথ্যাচার করার জন্য সে কাফের (আল মুহাল্লা, ৭/৪৮৫)।

প্রশ্ন (৩): মৃত্যুর সময় যমযমের পানি খাওয়ালে সেই ব্যক্তি কি জান্নাতী হবে?

শাহিন
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তর: যমযমের পানি আল্লাহর দেওয়া এক বিশেষ নেয়ামত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করেছেন। তার মাঝে রয়েছে তৃপ্তিকর খাবার ও অসুস্থতার আরোগ্য। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বরকতপূর্ণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ' (আল-মু'জামুছ ছগীর, হা/২৯৫)। তবে মৃত্যুর সময় যমযমের পানি পান করলে জান্নাতী হবে এটি একটি ভুল ধারণা; বরং তার আমল ও আক্বীদার উপর জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।

প্রশ্ন (৪): আমি আয়নায় তাকালে অনেক সময় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। সেক্ষেত্রে নিজের প্রতি নিজের কি নযর লাগতে পারে? কোনো দু'আ আছে কি যা পড়লে নিজের প্রতি নিজের বদনযর লাগবে না? আয়না দেখার কোনো দু'আ আছে কি? আর অন্যের বদনযর থেকে বাঁচার দু'আ কী?

মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
সরকারি হাসপাতাল রোড, দাগনভূঞা, ফেনী।

উত্তর: প্রয়োজন অনুযায়ী আয়না দেখা জায়েয। নাফে' ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু সম্পর্কে বলেন, তিনি মুহরিম অবস্থায় আয়না দেখতেন (সুনানে কুবরা লিল বায়হাক্বী, হা/৯১৪৪)। বিজোড় সংখ্যায় সুরমা দেওয়া, মাঝে মাঝে তেল দেওয়া, আয়না দেখা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা উত্তম কাজ (মুগনী, ১/১২৮; শারহুল উমদা, পৃ. ২৩২)। তবে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করা উচিত না। আর আয়নায় দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে আল্লাহর শুকর ও বরকতের দু'আ করা উচিত। কেননা বদনযর সত্য। নিজের ক্ষেত্রেও বদনযর লাগতে পারে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু

www.al-itisam.com

থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ‘বদনযর লাগা সত্য’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৪০)। আমের বিন রাবিয়া বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, ‘যদি তোমাদের কারো নিজেকে বা তার সম্পদ বা অন্য ভাইয়ের কোনো কিছু ভালো লাগে, তাহলে সে যেন তার জন্য বরকতের দু‘আ করে। কেননা নযর লাগা সত্য’ (ছহীহুল জামে, হা/৫৫৭)। আর আয়না দেখার কোনো দু‘আ নির্দিষ্ট নেই। যেগুলো বর্ণনা এসেছে সেগুলো মাওযূ (জাল)। তবে রাসূল ﷺ একটি দু‘আ সবসময় করতেন। এটা আয়না দেখার সাথে নির্দিষ্ট না। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اللهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার গঠন ও আকৃতি যে রকম সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রকেও অনুরূপ সুন্দর করো’ (ছহীহুল জামে, হা/১৩০৭)। বদনযর থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দু‘আগুলো পড়া যেতে পারে- أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ঠ হতে পানাহ চাচ্ছি’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১)। আরও বলা যেতে পারে- بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ‘আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও যমিনের কোনো বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী’। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, সকাল হওয়া পর্যন্ত তার উপর হঠাৎ কোনো বিপদ আসবে না। আর যে তা সকালে তিনবার বলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর হঠাৎ কোনো বিপদ আসবে না’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৫২৮)। আর বদনযর লাগলে দু‘আ হলো, আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ একবার কোনো এক রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম নবীজি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। জিবরীল আলাইহিস সালাম তখন এ দু‘আটি পড়লেন, بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. ‘আল্লাহর নামে আপনাকে ফুঁক দিচ্ছি; যেসব জিনিস আপনাকে কষ্ট দেয়, সেসব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদনযর থেকে আল্লাহ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ফুঁক দিচ্ছি’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮৬)।

প্রশ্ন (৫): অন্যায়ভাবে কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইকে হত্যা করে আর সেই মুসলিম ভাই (যিনি মারা গিয়েছেন) যদি বেনামাযী হয়, তাহলে কি সে (নিহত) জান্নাতে যাবে?

মো. রনি ইসলাম
পূর্ব বালিয়াডাঙ্গা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা মহাপাপ যার শাস্তি ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি’ (আন-নিসা, ৪/৯৩)। রাসূল ﷺ বলেন, ‘কিয়ামতের দিন (মানবাধিকার সম্পর্কিত) সর্বপ্রথম হিসাব হবে রক্তের’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৩৩)। অন্যায়ভাবে নিজের জান, মাল রক্ষা করতে গিয়ে কাউকে হত্যা করা হলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। সাঈদ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ এবং যে নিজ পরিবারের লোকের জন্য মারা যায়, সে শহীদ’ (নাসাঈ, হা/৪০৯৪)। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তি জান্নাতী হবে নাকি জাহান্নামী হবে সেটা বলার অধিকার কারো নেই। উমার ইবনু খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খায়বারে অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘কখনই না। গনীমতের মাল থেকে চাদর আত্মসাৎ করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৯)। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না। তার যে নেকী ও পাপ আছে সেগুলোর হিসাব আল্লাহই করবেন ও সে অনুযায়ী তিনিই ফায়সালা হবে।

প্রশ্ন (৬): আহলে কুরআন যারা আল্লাহ ও কুরআনকে বিশ্বাস করে। মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মানে কিন্তু রাসূল হিসেবে অন্য ব্যক্তিকে মানে। ছাহাবীদেরও সম্মান করে না। জানি না কোনো ওযর আছে কি-না। এমন মেয়েকে বিয়ে করা কি জায়েয?

ইমামুল কাবীর
কুমিল্লা।

উত্তর: রাসূল ﷺ-কে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন, ‘অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তাঁর জন্য বড়ই বেদনাদায়ক।

তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু' (আত-তাওবা, ৯/১২৮)। সুতরাং যারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মানে না তারা কাফের। যারা রাসূল ﷺ-এর হাদীছকে মানে না তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআনকেই অস্বীকার করে। যারা তাঁর ছাহাবীকে অসম্মান করে তারা মুনাফিক্ব। অতএব, এমন মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে আহলে কুরআন একটি বাতিল ফেরকা যারা কুরআন মানার দাবি করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআনও মানে না, হাদীছও মানে না। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং দেশ ও জাতিকে সতর্ক করতে হবে।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৭): ওযূ করার সময় যদি কখনো মনের ভুলে কোনো অঙ্গ তিনবারের বেশি ধোয়া হয়ে যায়, তাহলে কি আবার ওযূ করতে হবে?

মুমেনুজ্জামান শুভ
জামালপুর।

উত্তর: না, পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ উম্মতের ভুল করা ও ভুলে যাওয়াকে মাফ করে দিয়েছেন। আবূ যার আল-গিফারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেওয়া হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৩)। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তিনবারের বেশি করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে ওযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওযূর অঙ্গ তিন-তিনবার ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন, 'ওযূ এরূপেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়াল সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন ও যুলম করল' (নাসাঈ, হা/১৪০)। ইমাম নববী রহিমাহুল্লা-হ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তিনবারের বেশি করে তবে সে অপছন্দনীয় কাজ করল। কিন্তু এর দ্বারা তার ওযূ বাতিল হবে না (আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ১/৪৪০)।

প্রশ্ন (৮): মযীর বিস্তারিত বিধান কী?

আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা
হাইযুল বাদিয়া, দাম্মাম।

উত্তর: মযী হলো যা বীর্যের চেয়ে হালকা। কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে রসিকতা ও চুম্বন করার সময় বের হয়ে থাকে (আল-গরীবাইনি ফীল কুরআন ওয়াল হাদীছ, ৬/১৭৩৮)। এটি শরীরে লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে এবং এটি বের হলে ওযূই যথেষ্ট। গোসল করার প্রয়োজন নেই। সাহল ইবনু হুসাইফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো, তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'মযী বের হওয়ার পর ওযূ করাই যথেষ্ট'। তখন আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কী করব? তিনি বলেন, 'কাপড়ের যে যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক আজলা পানি নিয়ে উক্ত স্থানে ছিটিয়ে দিবে' (আবূ দাঊদ, হা/২১০)। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন পুরুষ ছিলাম যে, আমার অত্যন্ত বেশি মযী নিঃসরণ হতো। তাই ছাহাবী মিকদাদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে নেওয়ার জন্য বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় নবী ﷺ বললেন, 'তার জন্য ওযূ করতে হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩২)।

প্রশ্ন (৯): আমি জেনেছি যে টয়লেটে আল্লাহর নাম নেওয়া যায় না। কিন্তু আমার বাসার গোসলখানা ও টয়লেট একসাথে। তাই আমি প্রথমে মগে পানি ভরে ভেতরে রেখে বাইরে এসে বিসমিল্লাহ বলে এরপর ওযূ করি। আমার এই পদ্ধতি কি ঠিক আছে?

মো. সিয়াম হোসেন
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: প্রথমত সম্ভব হলে টয়লেট ও গোসলখানা আলাদা করা উচিত এবং বাথরুমে ওযূ না করাই উত্তম। কিন্তু বাথরুম ও গোসলখানা যদি একসাথে হয় এবং সেখানে ওযূ করতেই হয়, তাহলে সেখানে ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলাতে সমস্যা নেই। বাহিরে এসে বিসমিল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, বাথরুম অব্যশই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত হয় না যে (সঠিকভাবে) ওযূ করে না এবং ঐ ব্যক্তির ওযূ হয় না যে তাতে আল্লাহর নাম নেয় না' (আবূ দাঊদ, হা/১০১)।

ছালাত

প্রশ্ন (১০): কোন কোন অবস্থায় দুই ওয়াক্ত ছালাত (যোহর-আছর ও মাগরিব-এশা) জমা করে পড়া জায়েয আছে?

মুহাম্মাদ বিল্লাল
ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর: মানুষের সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা দুই ওয়াক্তের ছালাত একসাথে পড়ার বিধান দিয়েছেন। রাসূল ﷺ

নিম্নোক্ত সময়গুলোতে ছালাত জমা করে পড়েছেন- ১. হজ্জের সময় আরাফাহ ও মুযদালিফার মাঠে (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬), ২. সফরে থাকাকালীন সময়ে (আবূ দাঊদ, হা/১২০৬), ৩. অসুস্থতার সময় (আবূ দাঊদ, হা/২৮৭), ৪. বৃষ্টির সময় (আবূ দাঊদ, হা/১২১০), ৬. শারঈ কোনো ওযর থাকলে (শক্রুর ভয়, দুগ্ধদানকারিনী) (ছহীহ মুসলিম, হা/৭০৫)।

প্রশ্ন (১১): তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছালাত আদায় করা সুন্নাত, ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব?

মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করা সুন্নাত। আবূ কাতাদা সুলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে নেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪)। ইমামদের ফতওয়া এব্যাপারে একমত যে, এখানে আদেশটি ইসতিহবাবের জন্য।

প্রশ্ন (১২): অমুসাফির বা স্থানীয় ইমামের পিছনে মুসাফির কি পুরো ৪ রাকআত ছালাত পড়বে নাকি শুধু কছর ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিবে?

এনামুল হক
ঢাকা।

উত্তর: মুসাফির অবস্থায় মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে ফরয ছালাত পূর্ণই আদায় করবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, মুসাফির মুক্বীম ইমামের সাথে দুই রাকআত পেলে তাকে তাদের মতোই পূর্ণাঙ্গ ছালাত আদায় করতে হবে (সুনানে বায়হাক্বী, হা/৫২৯১; ইরওয়াউল গালীল, হা/৫৭১)। মূসা বিন সালামা বলেন, আমরা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সাথে মক্কায় ছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যখন তোমাদের সাথে থাকি তখন চার রাকআত ছালাত আদায় করি (মুক্বীম ইমামের পিছনে) আর যখন আমাদের তাবুতে যায় তখন দুই রাকআত আদায় করি (এটার কারণ কী?)। তিনি বললেন, এটাই আবূল কাসেমের সুন্নাত (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৬২; আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৪২৯৪)।

প্রশ্ন (১৩): হাসপাতালে চলাচলের সময় বোরকায় ময়লা লাগতে পারে। এই বোরকা পরে ছালাত হবে কি?

সুমাইয়া আফরিন।

উত্তর: শরীআতে সন্দেহ ধর্তব্য নয়। সুতরাং লাগতে পারে এজন্য বোরখা খোলা আবশ্যক নয়। ছালাত কবুল হওয়ার হওয়ার একটি শর্ত হলো মুছল্লীর শরীর ও পোশাক পবিত্র থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র করুন' (আল-মুদ্দাচ্ছির, ৭৪/৪)। তবে কোথাও চলাচলের সময় শুকনো ময়লা লাগলে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে। ইবরাহীম ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আওফের উম্মু ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বলেন, আমার আঁচল ঝুলিয়ে রাখি এবং আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এর পরবর্তী স্থান এ আঁচলকে পবিত্র করে দেয়' (আবূ দাঊদ, হা/৩৮৩)। যদি কেউ নোংরা জায়গা দিয়ে হাঁটে তাহলে তার পা ধোয়া জরুরী নয়, তবে যদি তরল কোনো নাজাসাত লাগে শুধু সেটুকু ধুয়ে ফেলতে হবে (তিরমিযী, ১/১৪৩)।

প্রশ্ন (১৪): কোনো এক যুবক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে কিন্তু দাড়িও কাটে। এখন এই যুবকের ছালাত কি কবুল হবে?

মো. হাফিজুল ইসলাম
পূর্ব বালিয়াডাঙ্গা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিমের উচিত পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? (আল-বাকারা, ২/৮৫)। সুতরাং ছালাত আদায়কারীদের অবশ্যই দাড়ি রাখতে হবে। তবে ছালাত কবুল হওয়ার জন্য দাড়ি রাখা শর্ত করা হয়নি। সুতরাং তার ছালাত ছহীহ হবে। কিন্তু এই বিধান পালন না করার কারণে সে পাপী হবে।

প্রশ্ন (১৫): বিতর ছালাত কি ১ রাকআত পড়া যাবে? পড়ার নিয়ম কী?

মো. আদনান
মগবাজার, ঢাকা।

উত্তর: যাবে। আবূ আইয়ূব আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বিতর ছালাত ওয়াজিব। অতএব, কেউ চাইলে তা পাঁচ রাকআতও পড়তে পারে, তিন রাকআতও পড়তে পারে এবং এক রাকআতও পড়তে পারে' (ইবনু মাজাহ, হা/১১৯০)। এক রাকআত বিতর ছালাত পড়ার পদ্ধতি হলো, স্বাভাবিকভাবেই তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা ছালাত শুরু করে ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর যেকোনো একটি সূরা পাঠ

করবে। তারপর স্বাভাবিকভাবেই রুকূতে যাবে। রুকূ থেকে উঠার পর দাঁড়ানো অবস্থায় দুই হাত উত্তোলন করে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দু'আ কুনূত পাঠ করবে। তারপর যথারীতি সিজদায় যাবে এবং বাকী ছালাত স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।

প্রশ্ন (১৬): সিজদায় এই দু'আটি পড়তে পারব কি না? আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিআন্নাকা আংতাল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা আংতাল আহাদুস সামাদ, আল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন রায়হান
পশ্চিম শহীদ নগর, অক্সিজেন, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর: সিজদায় কুরআনে বর্ণিত দু'আ ব্যতীত হাদীছের দু'আগুলোর মাধ্যমে দু'আ করা যাবে। সিজদার অনেক দু'আ রয়েছে- ১. সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা ও বিহামদিহী। (আবূ দাঊদ, হা/৮৭০)। ২. সুবহানাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফির লী (ছহীহ বুখারী, হা/৪২৯৩)। ৩. সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৭)। ৪. সুবহা-নাযিল জাবারূতি, ওয়াল মালাকুতি, ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল আযামাতি (আবূ দাঊদ, হা/৮৭৩)। এ দু'আর ব্যাপারে হাদীছে এসেছে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি একক, তুমি ঐ সত্তা যে, তুমি কারো হতে জন্ম নাওনি এবং কাউকে জন্মও দাওনি, কেউই তোমার সমকক্ষ নয়। তিনি বললেন, 'তুমি এমন নামে আল্লাহর কাছে চেয়েছ, যে নামে চাওয়া হলে তিনি দান করেন এবং যে নামে ডাকা হলে সাড়া দেন (আবূ দাঊদ, হা/১৪৯৩)। সুতরাং এ দু'আ দ্বারা সিজদায় দু'আ করা যাবে।

প্রশ্ন (১৭): ছালাত জান্নাতের চাবি, এ হাদীছ কি সঠিক?

সাদেকুল ইসলাম
বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর: হাদিছটি যঈফ। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জান্নাতের চাবি হচ্ছে ছালাত, আর ছালাতের চাবি হচ্ছে ওযূ' (তিরমিযী, হা/৪)। সনদে সুলায়মান বিন কারম থাকার কারণে এ হাদীছের প্রথম অংশ দূর্বল (শারহু সুনানে তিরমিযী, ৩/১২; যুআফা লিল উকাইলি, ২/১৩৬)।

প্রশ্ন (১৮): ফরয, নফল প্রত্যেক ছালাতের শুরুতেই কি ছানা পড়া লাগবে?

নাহিদ বিন বাবুল
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: প্রত্যেক ছালাতে হোক ফরজ কিংবা নফল, তাকবীরে তাহরীমার পর ও ক্বিরাআত পড়ার আগে ছানা পড়া সুন্নাত। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও ক্বিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন, 'এ সময় আমি বলি- اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ 'হে আল্লাহ! আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান করে দাও যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ্ আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র করো যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে বরফ, পানি ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৪)। ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা এটাকে ফরয বলব না। কেননা এটা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি কর্ম। যার ব্যাপারে আদেশ করা হয়নি। সুতরাং তাঁর অনুসরণ করা উত্তম (আল মুহাল্লা, ৩/১২)। আবার রাতের নফল ছালাতে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতের বেলা যখন ছালাত আদায় করতেন তখন কীভাবে তাঁর ছালাত শুরু করতেন? জবাবে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, রাতে যখন তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাত আদায় করতে উঠতেন তখন এ দু'আটি পড়ে ছালাত শুরু করতেন, اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও যমিনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলোর ফায়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি

আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল-সহজ পথ দেখিয়ে থাক (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭০)।

প্রশ্ন (১৯): ছালাত ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কী কী?

আব্দুস সালাম
রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: বিভিন্ন কারণে ছালাত ভঙ্গ হতে পার- ১. ছালাতের মাঝে খাওয়া কিংবা পান করা (আল-আওসাত্ব, ৩/২৪৯)। ২. ছালাতের প্রয়োজন ব্যতীত কোনো কথা বলা (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৩৪)। ৩. রুকনগুলোকে আগে-পরে করা (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮)। ৪. অট্টহাসি দেওয়া (সুনানে দারাকুত্বনী, হা/৬৫১)। ৫. ওযূ নষ্ট হয়ে যাওয়া (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫)। ৬. ছালাতের কোনো রুকন বা শর্ত ছেড়ে দেওয়া। যেমন- রুকূ, সিজদা (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৭)। ৭. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রুকন অতিরিক্ত করা। যেমন- রুকূ করা (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/২০০)।

প্রশ্ন (২০): জানাযার ছালাতে ইমামকে মাইয়েতের কোন বরাবর দাঁড়াতে হবে?

শাহাদাত হোসাইন
জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর: পুরুষের জানাযার ছালাতে ইমাম দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো মাথার সম্মুখ বরাবর দাঁড়ানো। আর মহিলার ক্ষেত্রে মাইয়েতের মাঝ বরাবর। সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন প্রসূতি মহিলা মারা গেলে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। ছালাতে তিনি মহিলার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩১)। নাফে‘ বলেন, আমি আনাস বিন মালেকের সাথে এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি তার মাথার বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন (আহমাদ, হা/১৩১১৪)।

প্রশ্ন (২১): বায়ু আটকিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: ছালাত হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম। এজন্য প্রত্যেকের উচিত প্রশান্তি সহকারে ছালাত আদায় করা। প্রস্রাব, পাখয়ানা কিংবা বায়ু নিঃসরণের চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, খাবার হাজির হলে কোনো ছালাত আদায় চলবে না কিংবা পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ নিয়ে ছালাত আদায় চলবে না (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬০)। সুতরাং কোনো প্রয়োজন থাকলে তা ছালাতের আগেই পূরণ করে নিতে হবে। ছালাতের মাঝে কোনো বড় বেগ আসলে তা পূরণ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা বায়ুর অতিরিক্ত চাপ থাকলে ছালাতে খুশূ-খুযূ থাকে না (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, ১২/৪৩৫)।

প্রশ্ন (২২): বিড়ি বা তামাক কারখানায় কাজ করলে ছালাত হবে কি?

আলিফ বিন জাহাঙ্গির কবীর
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: বিড়ি, তামাক বা যেকোনো নেশাদার দ্রব্য উৎপাদন, কেনাবেচা, কিংবা তাতে কোনোভাবে সহযোগিতা করা ইসলামে হারাম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মদ, তা পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়- এদের সকলকে আল্লাহ লা‘নত করেছেন’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৬৭৪)। ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য নেশাদার দ্রব্যের সাথে সম্পর্কহীনতার শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং সেই ছালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা কবুল হওয়া বা না হওয়া আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পবিত্র ব্যতীত কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করে বললেন, ‘দীর্ঘ ভ্রমণে এলোমেলো চুল ধুলামলিন চেহারার ব্যক্তি দুই হাত আকাশের দিকে তুলে বলছে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার আহার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম। তার হারাম খাবার দিয়ে পুরো দেহ গড়ে উঠেছে। তাহলে কীভাবে তার দু‘আ কবুল হবে?’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৩): বগলের লোম কি কাটতে হবে না টেনে উঠাতে হবে? দাড়ি ছাঁটার বিধান কী?

আব্দুল্লাহ
রাজবাড়ি।

উত্তর: বগলের লোম টেনে তুলে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলা সুন্নাত। দশটি কাজ নবীগণের ফিত্বরাত বা স্বভাবসুলভ- (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেওয়া, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙুলের জোড়াসমূহ ধোয়া, (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পানি দিয়ে ইসতেঞ্জা করা। মুসআব বলেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটি হলো, কুলি করা (আবূ দাঊদ, হা/৫৩)। দাড়ি ছেড়ে দেওয়া রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। তা কাটা বা

তুলে ফেলা বা কোনো ঔষধ ব্যবহার করে না উঠতে দেওয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা দাড়ি লম্বা করো, মুশরিকদের বিরোধিতা করো’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২)। তবে যদি বগলের লোম তুলে ফেলা না যায় তাহলে নিরূপায় হয়ে তা কেটে ফেলা যায়।

প্রশ্ন (২৪): ফসলের জমি ইজারা দেওয়া কি শরীআতসম্মত?

জোবায়ের হোসেন
চরবসন্তী, নকলা, শেরপুর।

উত্তর: জমি ইজারা বা ভাড়া দেওয়া বা নেওয়াতে শরীআতে কোনা বাধা নেই। তবে তা পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ (অর্ধেক/এক-তৃতীয়াংশ/এক-চতুর্থাংশ) মালিককে দেওয়া বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হতে হবে। হানযালা ইবনু কায়স আনছারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাফে‘ ইবনু খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে লোকেরা পানির ঝর্ণার পাশ্ববর্তী অংশ, খালের অগ্রভাগের ভেজা অংশ ও ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধা নেওয়ার শর্তে জমি ভাড়া দিত। এতে কখনও এক অংশ বিনষ্ট হতো ও অপর অংশ ভালো থাকত। আবার কখনও এ অংশ ভালো থাকত আর অপর অংশ বিনষ্ট হতো। আর এ ধরনের বর্গায় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হতো না। এ কারণে তিনি এ থেকে নিষেধ করেন। আর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের (স্বর্ণ-রৌপ্যের) বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪৪)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৩২৯)।

প্রশ্ন (২৫): ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কমার্শিয়াল যানবাহন কেনা যাবে কি না?

আজমাল হোসাইন
শিহাবগঞ্জ, ভারত।

উত্তর: যাবে না। সূদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি ইসলামে হারাম। সুতরাং সূদ দিয়ে লোন নিয়ে তা দিয়ে কমার্শিয়াল যানবাহন কেনা যাবে না। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। তিনি আরও বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক’ (আল-বাকারা, ২/২৭৮)। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের (চুক্তি বা হিসাব) লেখককে অভিসম্পাত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৩৩৩৩)।

প্রশ্ন (২৬): আমি পৃথিবীর যেকোনো দেশে গিয়ে ব্যবসা কিংবা চাকরি করার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে চললে আমি হালাল উপায়ে ব্যবসা কিংবা চাকরি করতে পারব?

শাহরিয়ার কবির
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর: ১. প্রথমত, তাক্বওয়া বা আল্লাহর ভয় থাকা। আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, ‘তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো’ (তিরমিযী, হা/১৯৮৭)। আল্লাহ বলেন, ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন’ (আত-তালাক, ৬৫/২-৩)। ২. হারাম বা সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে দূরে থাকা। রাসূল ﷺ বলেন, ‘আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে হারামের মাঝে লিপ্ত হয়ে পড়ে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৮৬)। তিনি আরও বলেন, ‘পাপ হলো যা তোমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ করো’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪১০)। ৩. ইবাদতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে’ (আন-নূর, ২৪/৩৭)। ৪. ধোঁকা না দেওয়া। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শারঈ দিক-নির্দেশনাগুলো মেনে চলা। ৫. মিথ্যা না বলা বা কোনো কিছু গোপন না করা। হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যদি তারা (ক্রেতা-বিক্রেতা) সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/২০৭৯)।

প্রশ্ন (২৭): বাড়িতে কবুতর, বিড়াল, ও কুকুর পালন করা যাবে কি?

আব্দীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: বিড়াল বা কবুতর পালনে কোনো বাধা নেই যদি তাদের খাবার ও পানীয় দেওয়া হয়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সূত্রে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমিনের পোকামাকড় খেতে পারত’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩১৮)। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি তিনি আমার এক ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আবূ উমায়র! কেমন আছে তোমার নুগায়র? (ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৯)। কুকুর পালন করা তখন বৈধ হবে যখন তা বাড়ি-ঘর, ক্ষেতখামার পাহারা, পশু চড়ানো কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করা হবে। অনথ্যায় দুই কিরাত তথা উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ নেকী কমে যাবে। সালিম তার পিতার থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা গৃহপালিত পশুর পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার ছওয়াব থেকে দুই কিরাত করে কমতে থাকবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯১৬)।

প্রশ্ন (২৮): অনেক এলাকায় মৎস্য শিকারী পুকুরে টিকিট কেটে মাছ ধরে। এই টিকিট কেটে মাছ ধরা হালাল নাকি হারাম?

মো. শাহরিয়ার কবীর
হরিরামপুর, মীরগঞ্জ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর: এভাবে টিকিট কেটে মাছ ধরা হারাম। কেননা এটা এক প্রকার ধোঁকা। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হলো ক্রেতা বিক্রিত জিনিসের পরিমাণ, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জেনে নিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে কিছু অবগত হওয়া যায় না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনাবেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৩)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)।

প্রশ্ন (২৯): আমার ফুফু জীবিত থাকা অবস্থায় ভিডিও করে রেখেছিলাম। আমার ফুফু বর্তমানে মারা গেছে। এখন কি আমার ফুফুর ভিডিওটা দেখতে পারব?

শাহীন
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর: শারঈ কোনো ফায়দা না থাকলে মৃত ব্যক্তির কোনো ছবি বা ভিডিও সংরক্ষণ করা যাবে না। কেননা ছবি বা ভিডিওর সাহায্যে মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ এগুলো দেখে শোকে মর্মাহত হয়। অথচ মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হতে নিষেধ করা হতো (ছহীহ বুখারী, হা/৩১৩)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলীকে বলেছিলেন, ‘কোনো (প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি দেখলেই তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সমান করে দেবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে তাতে জীবন দাও’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫১)। উল্লেখ যে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রাণীর ছবি তোলা বা তা সংরক্ষণ করা যাবে না এবং অতিসত্বর তা ধ্বংস করে দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩০): ইসলামী আলোচনায় আলাদা কোনো মিউজিক লাগানো যাবে কি?

আল আমিন
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: মিউজিক ব্যবহার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কোনো ইসলামী আলোচনায় কোনো মিউজিক ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত, আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (লুকমান, ৩১/৬)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০)। নাফে‘ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে উভয় কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে

গিয়ে আমাকে বললেন, হে নাফে‘! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কান থেকে হাত তুলে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি এ ধরনের শব্দ শুনে এরূপ করেছিলেন (আবূ দাঊদ, হা/৪৯২৪)।

হালালের মাঝে হারামের সংমিশ্রণ করলে সেটা হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং ইসলামী আলোচনার মাঝে হারাম মিউজিক যোগ করা উচিত নয় এবং এমন আলোচনা শুনাও বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৩১): আমি গার্মেন্টসে চাকরি করি। এ চাকরি করা কি বৈধ?

সাদিকুল ইসলাম
কাশিগঞ্জ বাজার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: উৎপাদিত পণ্যটি যদি বৈধ হয় তাহলে গার্মেন্টসে চাকরি করা বৈধ ও তার উপার্জনও বৈধ। তবে সাধারণত বর্তমানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে নারী-পুরুষ একত্রে মিলেমিশে কাজ করে থাকে, যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। এহেন পরিবেশে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা থাকলে সেখানে কাজ করা ঠিক হবে না। উসামা ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ‘পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা আমি রেখে গেলাম না’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯৬)।

প্রশ্ন (৩২): মহিলাদের মাথার চুলকে প্রক্রিয়াজাত করে মাথার ক্যাপ তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে কি?

মো. সুজন রানা
নেয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর: মানুষ সকল প্রাণির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। মানুষের প্রতিটি অঙ্গই সম্মানিত। মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রতঙ্গ কিংবা কর্তিত কোনো অংশ ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না এবং ব্যবহার করাও যাবে না। সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করাও যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি’ (আল-ইসরা, ১৭/৭০)। সুতরাং শরীরের কোনো অংশকে তুচ্ছজ্ঞান করে লাঞ্ছিত করা বৈধ নয় (আল-মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ, ২৬/১০২)।

কবর

প্রশ্ন (৩৩): আমাদের পাড়ায় এক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন, যাকে পাড়ার সবাই চেনে। সকলে বলে, সে যদি মারা যায়, তবে তার কবরটিকে পাকা করে স্থায়ী করা হবে। তবে সেই ব্যক্তি তার কবর পাকা করা হোক তা পছন্দ করতেন না এবং নিষেধ করতেন। তবুও মানুষ তাকে খুব সম্মান করে তার মৃত্যুর পর কবরটি পাকা করা হয়। এক্ষেত্রে কি তিনি গুনাহগার হবে?

শফীউর রহমান
পবা, রাজশাহী।

উত্তর: রাসূল ﷺ কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ﷺ কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও তাতে গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭০)। শরীআতে নিষিদ্ধ কোনো কাজের মাধ্যমে কাউকে সম্মান দেওয়া হয় না। যেহেতু তিনি কবর পাকা করা পছন্দ করতেন না এবং নিষেধ করতেন সেহেতু তিনি এ পাপের ভাগীদার হবেন না। আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না’ (আল-আনআম, ৬/১৬৪)। এ সমস্ত পাপ যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে এবং উম্মতকেও সতর্ক করতে হবে। উল্লেখ যে, যারা এ কাজের সাথে যুক্ত তারা সকলেই পাপী হবে।

প্রশ্ন (৩৪): কবরে কয়টি প্রশ্ন করা হবে ও সেগুলো কী কী?

আরমান হোসাইন
নিউ মার্কেট, খুলনা।

উত্তর: কবরে মূলত তিনটি প্রশ্ন করা হবে। বারা বিন আযেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘অতঃপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কীভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি (আবূ দাঊদ, হা/৪৭৫৩)।

প্রশ্ন (৩৫): আমরা কবরে যখন মাটি দেই, এটি কি শুধু ডান হাত দিয়ে দিতে হবে, নাকি দুই হাতে দিতে হবে?

মো. আব্দুল্লাহ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর: কবরে মাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে দুই হাত ব্যবহার করে তিন অঞ্জলি মাটি কবরের উপর দিতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির জানাযার

ছালাত পড়লেন, অতঃপর মৃতের কবরের নিকট এসে তার মাথার দিকে তিন অঞ্জলি মাটি ছড়িয়ে দিলেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৫৬৫)। উল্লেখ্য যে, কবরের উপর ছাড়া অন্য কোথাও মাটি দেওয়ার প্রথা বর্জনীয়।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৬) : সহবাসের নিয়ম কী? স্বামী যদি জোর করে পায়ুপথে সহবাস করতে চায় সেক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কী? স্ত্রী কি স্বামীর থেকে তালাক নিয়ে নিবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পায়ুপথে সহবাস করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক। এ কর্মের জন্য লূত আলাইহিস সালাম-এর জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা নোংরা রুচির কারণেই এমন বিকৃত মনমানসিকতা তৈরি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র হবে, তখন যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে তাদের কাছে গমন করবে’ (আল-বাকারা, ২/২২২)। অর্থাৎ তাদের লজ্জাস্থানে অন্য কোথাও না (তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১/৪৪১)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত’ (আবূ দাঊদ, হা/২১৬২)। আরেক বর্ণনায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করে সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, সে তা থেকে দায়মুক্ত’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৯০৪)। যদি স্বামী জোর করে পায়ুপথে সহবাস করতে চায় তাহলে তাকে বুঝাতে হবে। এরপরও সে যদি তার জঘন্য চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে না আসে এবং তারই উপর অটল থাকতে চায়, তাহলে স্ত্রী নিরুপায় হয়ে খোলা তালাক নিতে পারে।

প্রশ্ন (৩৭): কেউ কতবার আমার মায়ের দুধ পান করলে দুধভাই বা দুধবোন বলে গণ্য হবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পাঁচবার দুধপান না করালে হুরমাত সাব্যস্ত হবে না (রওযাতুত্ব ত্বলীবিন, ৯/৭)। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, পাঁচবারের কমে দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে হবে বা পৃথক পৃথক পাঁচ চোষণ হতে হবে (আল-মুহাল্লা, ১০/১৮৯)। ইবনু তায়মিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোনো দুগ্ধপায়ী শিশু দুই বছর বয়সের মধ্যে কোনো মহিলার পাঁচ বার দুধ পান করে, তবেই ঐ মহিলা তার দুধমাতা হিসাবে সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়া আল-কুবরা, ৩/১৫৯)। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়’ (আল-বাকারা, ২/২৩৩)। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ‘দশবার স্তন্যপানে হারাম সাব্যস্ত হয়’। অতঃপর তা মানসূখ বা রহিত হয়ে যায় ‘পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়’-এর দ্বারা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হতো (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫২)।

প্রশ্ন (৩৮): স্ত্রীর মোহরানা স্বামী কর্তৃক আদায়ের বিধান কী?

এহেছানুল কবির
খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার।

উত্তর: স্বামী কর্তৃক মোহর আদায় করা ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের; তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান করো; তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে তজ্জন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান করো এবং কোনো অপরাধ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়’ (আন-নিসা, ৪/২৪)। তিনি আরও বলেন, ‘এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও’ (আন-নিসা, ৪/৪)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা পূরণ করা জরুরী, তা হলো সেই বস্তু যার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করে থাক’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৮)। সুতরাং স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করে দেওয়া।

প্রশ্ন (৩৯): মেয়ের বাবা যদি বিদেশ থাকে এবং কোনো বড় ভাই না থাকে, সেক্ষেত্রে কি মেয়ের ছোট ভাই ১৫ বছর বয়স বড় বোনের ওলী হয়ে বিয়ে দিতে পারবে?

আলাউদ্দিন
লেকসিটি কনকর্ড খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর: বিবাহের ক্ষেত্রে শর্ত হলো মহিলার ওলী বা তার দায়িত্বশীল দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ দিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে নারী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করল তার

বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল' (তিরমিযী হা/১১০১)। সুতরাং মেয়ের ওলী যদি কোনো কারণে উপস্থিত থাকতে না পারে তাহলে তিনি কাউকে উকিল বানিয়ে দিবেন। রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি আমর বিন উমাইয়াকে উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহ কবুলের ব্যাপারে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেছিলেন (মুগনী, ৫/৬৩)। বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় অন্য কেউ ওলী হতে পারবে না। তাই এক্ষেত্রে তিনি কাউকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দিবেন। উল্লেখ্য যে, উকিল বাবা নামে বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রথা চালু আছে তা হারাম ও বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৪০): আমার শাশুড়ি ও শ্বশুরের বিচ্ছেদের পর আমার শাশুড়ি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ঐ ব্যক্তির সামনে কি আমার স্ত্রীর পর্দা করতে হবে?

তানভীর
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাস করে তাহলে সেই মহিলার রক্তসম্পর্কীয় বা দুগ্ধসম্পর্কীয় সব মেয়ে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু বিবাহের পরে সহবাসের পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দেয় বা সেই মহিলা মারা যায় তাহলে তার মেয়েরা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে মিলিত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই' (আন-নিসা, ৪/২৩)।

সুতরাং বিবাহের পর যদি সহবাস হয়ে থাকে তাহলে তিনি মাহরাম বিবেচিত হবেন এবং ফেতনার আশংকা না থাকলে মাহরামের সাথে যেভাবে চলাফেরা করা যায় সেভাবে চলাফেরা করা যাবে।

দু'আ

প্রশ্ন (৪১): অভাব দূর ও রিযিক বৃদ্ধির জন্য কোনো দু'আ আছে কি?

আব্দুল্লাহ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর: অভাব দূর করা এবং রিযিক বৃদ্ধির জন্য রাসূল ﷺ থেকে বিভিন্ন দু'আ বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই' (নাসাঈ, হা/৫৪৬০)। ঋণের ব্যাপারে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলে রাসূল ﷺ তাকে শিখিয়ে দেন, اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ 'হে আল্লাহ! তোমার হালালের মাধ্যমে আমাকে তোমার হারাম হতে বিরত রাখ বা দূরে রাখ এবং তোমার দয়ায় তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে আত্মনির্ভরশীল করো' (তিরমিযী, হা/৩৫৬৩)। এছাড়াও বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ রিযিক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি বলেছি তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। (তোমরা তা করলে) তিনি অজস্র ধারায় তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন' (নূহ, ৭১/১০-১২)।

প্রশ্ন (৪২): কোনো ব্যক্তি যদি দু'আ চায় তাহলে সেক্ষেত্রে ফী-আমানিল্লাহ বলা যাবে কি?

আজমাল হোসেন
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি যদি বিশেষ কিছু উল্লেখ না করে সাধারণভাবে দু'আ চায় তাহলে তার জন্য যেকোনো দু'আ করা যেতে পারে যেগুলো দ্বারা রাসূল ﷺ দু'আ করেছেন। যেমন: রাসূল ﷺ আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য দু'আ করেছিলেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আনাস আপনারই খাদিম। আপনি তার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিন। আর তাকে আপনি যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দিন' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৭৮)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তাঁর নিকটে সুপেয় পানি আনা হলে তিনি তা পান করেন। পরে তিনি তাঁর ডান পাশের লোককে দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রাযিয়াল্লাহু আনহু

বলেন, অতঃপর আমার আব্বা তার সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাঁদের রিযিকে বরকত দাও, তাঁদের ক্ষমা করো এবং তাঁদের প্রতি দয়া করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৪২)। 'ফী আমানিল্লাহ' অর্থ হলো 'আপনাকে আল্লাহর নিরাপত্তায় সোপর্দ করছি'। দু'আর ক্ষেত্রে এটির বলার ব্যাপারে রাসূল ﷺ থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং রাসূল ﷺ যা দিয়ে দু'আ করেছেন সেগুলোর মাধ্যমেই দু'আ করা উচিত।

কুরআনের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৩): সূরা আল-বাকারার ১৫৭ নং আয়াত অনুসারে ছালাত ও রহমত এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কী?

রুফাইদা জান্নাত
দিনাজপুর।

উত্তর: সূরা আল-বাকারার ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ অর্থাৎ 'এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত' (আল-বাকারা, ২/১৫৭)। এখানে ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষমা করা। যেমন, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আবূ আওফার পরিবারকে ক্ষমা করো (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৭)। আর আল্লাহ তাদের পাপগুলো মার্জনা করবেন এবং তা ঢেকে রাখবেন বান্দার প্রতি রহমত করে (তাফসীরে তাবারী, ৩/৬৬৬)। এখানে ছালাত অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত করা যাবে না। কারণ আরবী ব্যকরণে দুটি বিপরীতার্থক শব্দকে আতফ (সংযোজন) করা হয় না। তবে এখানে ছালাত অর্থ কেউ বলেছেন, ঊর্ধ্বতন ফেরেশতাদের কাছে বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর প্রশংসা করা (তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১/৪৬৮)। সুতরাং ছালাত ও রহমত একই জিনিস নয়।

প্রশ্ন (৪৪): নূহ আলাইহিস সালাম কীভাবে শোকর আদায় করতেন যে আল্লাহ তাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে উল্লেখ করেছেন?

রুফাইদা জান্নাত
দিনাজপুর।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বলেন, إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا অর্থাৎ 'নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা' (বনী ইসরাঈল, ১৭/৩)। তিনি সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। এ ব্যাপারে সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নূহ আলাইহিস সালাম যখন কোনো খাবার খেতেন কিংবা কোনো পোশাক পরতেন, তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন তখন তাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে নাম দেওয়া হয় (শুআবুল ঈমান, হা/৪৪৭১; মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, হা/৩৪০৯)।

প্রশ্ন (৪৫): কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে গেলে পাপ হবে কি?

মাহফুজ বিন জহুরুল ইসলাম
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: নিঃসন্দেহে কুরআন অধ্যয়ন করা, তেলাওয়াত করা ও মুখস্থ করা নেকীর কাজ। কুরআন বেশি বেশি পাঠের মাধ্যমে স্মরণে রাখতে হবে। আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! কুরআন বাঁধন ছাড়া উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে দৌড়ে যায়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৩৩)। অলসতাবশত কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে কুরআন ভুলে গেলে পাপী হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উঠাব অন্ধ অবস্থায়' (ত্ব-হা, ২০/১২৪)। আবূ আলিয়া বলেন, আমরা বড় পাপ মনে করতাম যে কোনো ব্যক্তি কুরআন শিখে তারপর (না পড়ে) ঘুমায় এমনকি সে তা ভুলে যায় (ফাতহুল বারী, ৯/৮৬)। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে রাতে মসজিদে কুরআন পড়তে শুনলেন। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ তার প্রতি করুণা করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলতে বসেছিলাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৪২)।

হাদীছ বিশ্লেষণ

প্রশ্ন (৪৬): শিশুর কানে আযান দেওয়ার হাদীছ কি যঈফ? তাহকীক পেশ করলে উপকৃত হবো।

সামিরুল
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কানে ছালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন (আবূ

দাঊদ, হা/৫১০৫)। উক্ত হাদীছে উবাইদুল্লাহ বিন আ'সম নামক রাবীর দুর্বলতা থাকার কারণে উক্ত হাদীছ যঈফ (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৮৯; বায়ানুল ওহম ওয়াল ইহাম, ৪/৫৯৪)।

প্রশ্ন (৪৭): মাদকদ্রব্য সেবন করলে কি মা, খালা, ফুফুর সাথে ব্যভিচার করার সমপরিমাণ গুনাহ হয়? এ ব্যাপারে কোনো হাদীছ আছে?

মো. মনোয়ারুল ইসলাম
কুলিয়াডাঙ্গা, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তর: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মদ হলো অশ্লীলতার মূল এবং কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি তা পান করবে সে যেন তার মা, খালা ও ফুফুর সাথে যেনা করল (আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৩১৩৪; আল-মু'জামুল কাবীর, হা/১১৪৯৮; দারাকুত্বনী, হা/৪৬১২)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকলেও সমার্থক শাহেদ থাকার কারণে আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন (সিলসিলা ছহীহা, হা/১৮৫৩; ছহীহুল জামে, হা/৫৬৫৬)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): তওবা করার শর্ত কী কী?

আলিফ বিন জাহাঙ্গির কবীর
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর: তওবার শর্ত পাঁচটি- ১. তওবার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা (আত-তাহরীম, ৬৬/৮), ২. পাপ ছেড়ে দেওয়া ও তা ঘৃণা করা (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪১), ৩. পাপের ব্যাপারে অনুশোচনা করা (আহমাদ, হা/৩৫৬৮), ৪. পরবর্তীতে সেই পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা (আলে ইমরান, ৩/১৩৫), ৫. বান্দার হক্কের সাথে যুক্ত না হওয়া এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগে তওবা করা (আল-আনআম, ৬/১৫৮)।

প্রশ্ন (৪৯): তাক্বওয়া অর্জন করার উপায় কী?

আব্দুস সালাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হলো অন্তরের জিনিস। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তাক্বওয়া এখানে আছে'। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার তাঁর বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৩৫)। তাক্বওয়া বৃদ্ধি করার মাধ্যম হলো আল্লাহর আদেশকৃত কাজগুলো করা, নিষেধকৃত কাজগুলো ছেড়ে দেওয়া এবং তাঁর দেখানো পথের উপর চলা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হবার শক্তি দান করেন' (মুহাম্মাদ, ৪৭/১৭)। বেশি বেশি ছিয়াম পালন করা তাক্বওয়া বৃদ্ধির একটি অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার' (আল-বাকারা, ২/১৮৩)। উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া তাক্বওয়া অর্জনের একটি মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমিনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' (আলে ইমরান, ৩/১৩৩-১৩৪)। আল্লাহর নবী ﷺ-এর হেদায়াতকে আঁকড়ে ধরা ও বিদআত থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার' (আল-আনআম, ৬/১৫৩)।

প্রশ্ন (৫০): কীভাবে বসে খাওয়া সুন্নাত?

আয়েশা দিনা বিনতে এরশাদ
টিকাপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: খাবার খেতে বসার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো দুই হাঁটু মাটির সাথে লাগিয়ে ও নলার উপর ভর করে বসা বা ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা (ফাতহুল বারী, ৯/৫৪২)। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে (দুই হাঁটু যমিনে লাগিয়ে) উচুঁ হয়ে খেজুর খেতে লক্ষ্য করেছি (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৪৪)। তবে মানুষ চাইলে অন্যভাবেও বসে খেতে পারে। সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, হেলান দিয়ে খাওয়া উচিত নয়। আবূ জুহায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন- لَا آكُلُ مُتَّكِئًا 'আমি হেলান দিয়ে বসে খাই না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৯৮)। সুতরাং এভাবে বসে খাওয়া উচিত না। কারণ পরিমাণ মতো খাওয়া এবং বিনয়ের সাথে বসে খাওয়া সুন্নাত। হেলান দিয়ে বসলে খাওয়া বেশি হয় এবং তাতে বিনয় প্রকাশ পায় কম। উপুড় হয়ে খাওয়াও উচিত নয়। রাসূল ﷺ উপুড় হয়ে খেতে নিষেধ করেছেন (ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭০)।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর সার্বিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিন!

আস-সালামু আলাইকুম

সম্মানিত সুধী! আপনারা অবগত আছেন, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (নিবন্ধন নং s-12288-2016) দেশব্যাপী শিক্ষা, সেবা ও দাওয়াহ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, আল-হামদুলিল্লাহ!

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের চারটি জেলায় 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে যেখানে ৪৭১০ জন শিক্ষার্থী (যাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জন ইয়াতীম), ২২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রায় ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

বর্তমানে রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ শাখায় আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে জমি ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৬০ বিঘা জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে, এখনো ৩০০ শতক জমি (প্রায় তিন লক্ষ টাকা শতক হারে) ক্রয় করতে হবে। অত্র শাখায় দেশের বৃহত্তম বায়তুল হামদ জামে মসজিদের কাজ চলমান, যার পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ! মসজিদটির প্রতি তলায় সাত হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। বর্তমানে নিবরাস মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তানোর-গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে ৬০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে বর্তমানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে আদ-দাওয়া ইলাল্লাহ এর অধীনে দেশব্যাপী মসজিদভিত্তিক দ্বীন শিক্ষা প্রকল্প চলমান, যার অধীনে ইতোমধ্যে ৩০০ এর অধিক মক্তব চালু রয়েছে। ফ্রি মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সিলেবাস বিতরণ চলমান রয়েছে। এছাড়াও মাসিক আল-ইতিছামসহ বিভিন্ন বই ফ্রি বিতরণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

উপরিউক্ত মহতী কাজগুলো এগিয়ে নিতে দ্বীনী ভাই-বোনদের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সার্বিক সহযোগিতা কবুল করুন- আমীন!

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন;
মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

মাকতাবাতুস সালাফ

সিলসিলা ছহীহা

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

১ম ও ২য় খণ্ড

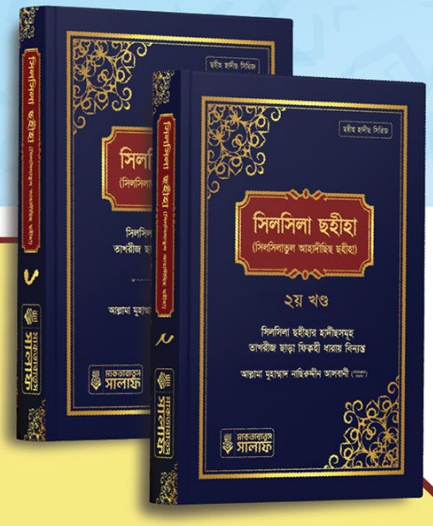

ইলমুল হাদীস বিষয়ে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.), তার অগাধ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হলো সিলসিলা ছহীহা। এতে তিনি হাদীছের মহাসমুদ্র তালাশ করে দুর্লভ মণিমুক্তাসমূহ সন্নিবেশ করে দিয়েছেন, যা মুসলিম উম্মাহর বহু অজানা হাদীছ জানার খোরাক মেটাবে।

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত

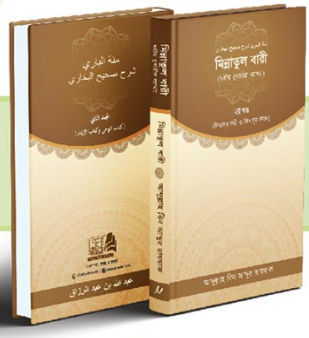

পৃষ্ঠা : ৬০৮
মূল্য : ৫৫০/-

মিন্নাতুল বারী

২য় খণ্ড (কিতাবুল অহী ও কিতাবুল ঈমান)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

পৃষ্ঠা : ৩৯২
মূল্য : ২২০/-

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজিট করুন tubapublication.com

রাজশাহী
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০